মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
আগস্ট ২০২২ ঈসায়ী
মুহাররম-সফর ১৪৪৪ হিজরী
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৯ বাংলা

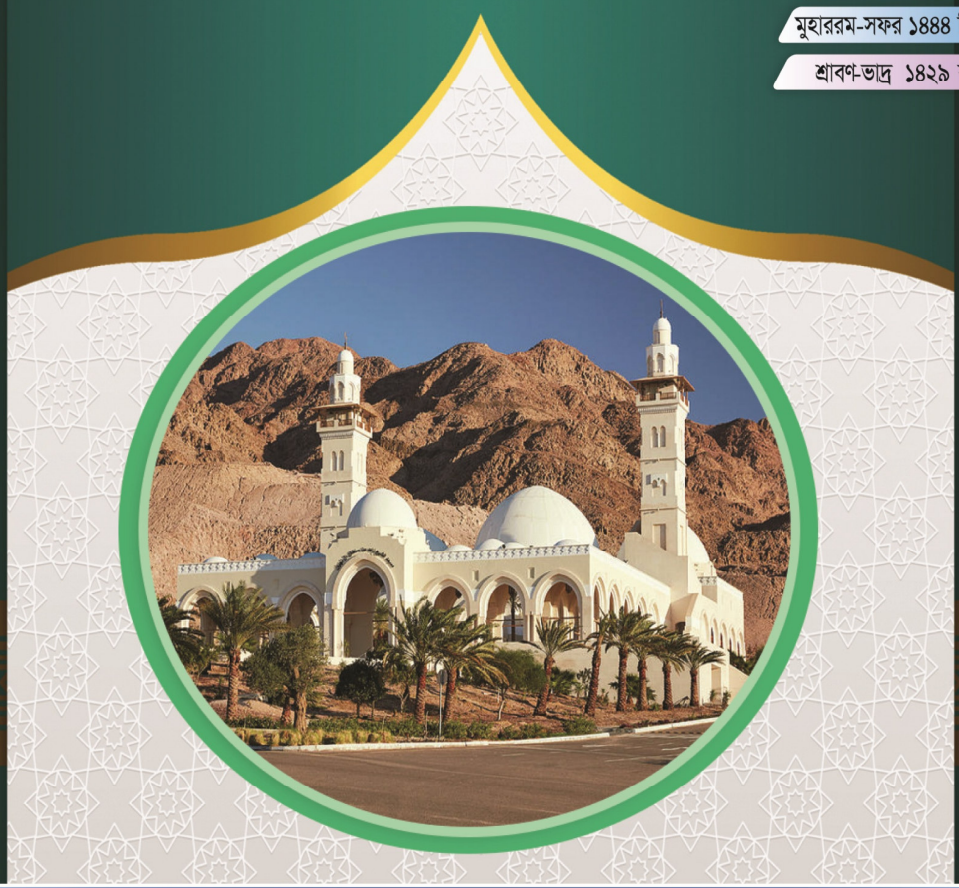

শেখ জায়েদ মসজিদ, জর্ডান

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব

৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

আগস্ট	২০২২ ঈসায়ী
মুহাররম-সফর	১৪৪৪ হিজরী
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله ترياقي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন

❖ আগুন হতে নিজেদেরকে বাঁচাও এবং পরিবার-পরিজনকেও ০৩
শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস

❖ মুহাররম ও আশুরার সিয়ামের ফযীলত.....০৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়

❖ স্বাগত হিজরী নববর্ষ ১৪৪৪ হি:.....১০

প্রবন্ধ :

❖ ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং তাওহীদ ও আকীদাহ.....১১
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

❖ অমুসলিমদের উর্দূ ভাষায় আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরার অনুবাদ ১৬
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীক

❖ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষন্নতা ১৯
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী

❖ দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা.....২১
শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক

❖ আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসবো কীভাবে.....২৫
আব্দুল্লাহ আরমান বিন রফিক

❖ বজ্র ও বিজলী.....৩০
সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা

❖ ইসলামী অর্থনীতির প্রথম পাঠ.....৩২
তাওহীদুল ইসলাম

❖ বিদায় হিজরী (১৪৪৩).....৩৭
সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব

❖ ইমামের মর্যাদা ৪০
শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান

❖ ক্বিয়ামুল লাইল; স্রষ্টার সান্নিধ্যে বান্দার প্রাপ্তি ৪২
মাযহারুল ইসলাম

❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৫

❖ কবিতা ৪৮

দারসুল কুরআন/مدروس القرآن

আগুন হতে নিজেদেরকে বাঁচাও এবং পরিবার-পরিজনকেও

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

আয়াতের অনুবাদ: হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর মনের ফেরেশতাকুল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তাই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।[১]

আয়াতের তাফসীর: আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তাআলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ করেছেন যে, তোমরা নিজেদেরেকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতার উল্লেখ করে এও বলেছেন যে, যারা জাহান্নামী হবে তারা কোনো শক্তি প্রয়োগ অথবা অন্যায়মূলক কিছু করে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এ আয়াত থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য শুধুমাত্র চেষ্টা করার মধ্যেই কোনো মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে পরিবারটির দায়িত্ব তার ওপরে ন্যস্ত সেই পরিবারের সকল সদস্য যাতে করে আল্লাহর পছন্দের মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে সে অনুযায়ী তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করাও তার দায়িত্ব।

এ মর্মে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها،

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। একজন ব্যক্তি তার অধীনস্ত লোকদের দায়িত্বশীল, তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। একজন নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা; তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।[২]

আল্লাহ তাআলার বাণী: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا আমীরুল মু'মিনীন আলী رضي الله عنه বলেন: জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য শিষ্টাচারিতা ও সুশিক্ষা প্রদান কর। আর কাতাদাহ رحمه الله বলেন: তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ করবে, তাঁর নাফরমানিমূলক কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তাদের উপর কর্তৃত্ব ও সহযোগিতা করবে। আর তাদেরকে যখন দেখবে আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজ করতে তখন তাদেরকে শাসন করবে। এই কর্মপন্থা হয়তবা জাহান্নামের আগুন থেকে সকলকেই রক্ষা করবে।[৩]

হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع»

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে পৌঁছলেই সালাতের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর হলে তাদেরকে এর জন্য শাস্তি প্রদান কর এবং তাদের শয়নের স্থান পৃথক করে দাও।[৪]

অনুরূপভাবে সালাতের এবং সওমের সময় হলে পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল ﷺ বলেন:

«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة

---

* সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা

[১] সূরা আত-তাহরীম আয়াত: ৬

[২] সহীহ বুখারী হা: ৮৯৩

[৩] আল-মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীব তাফসীর ইবনে কাসীর-১৪২২ পৃ: দ্র:

[৪] আবূ দাউদ হা: ৪৯৫

قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء»

আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর দয়া করুন, যে নিজে সালাত আদায় করতে রাতে ওঠে এবং তার স্ত্রীকেও ওঠায়, সে জাগ্রত হতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ নারীর প্রতিও দয়া করুন, যে নিজে রাতে সালাত আয়াদের জন্য জাগ্রত হয় এবং তার স্বামীকেও জাগায়, যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।[৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে আদম সন্তান ও পাথর দ্বারা। الْحِجَارَةُ শব্দ দ্বারা ঐ পাথর উদ্দেশ্য হতে পারে, দুনিয়ায় যেগুলোর পূজা করা হয়। যেমন অন্যত্র রয়েছে:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ -নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানি। তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে।[৬]

ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: ওটা হবে গন্ধকের পাথর যা হবে অত্যন্ত দুর্গন্ধময়।[৭]

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ এতে (শাস্তির কাজে) নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। কাফিরদের ব্যাপারে যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দয়া হবে না। আয়াতের মধ্যে شِدَادٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে, তাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, মযবুত ও ভীতিকর। আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তা তারা মুহূর্তের মধ্যে পালন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর তারা সব ধরনের আদেশ পালনে সক্ষমও বটে। তাদের নাম 'যাবানিয়াহ'। এরা হলেন জাহান্নামের পাহারাদার ও রক্ষক।[৮]

আলোচ্য আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি:

এক. প্রতিটি মানুষের জন্য আবশ্যক হল: তার পরিবার-পরিজনকে ভাল কাজের নির্দেশ করা, ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, মন্দ কাজের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। সালাত, যাকাত, সিয়ামসহ অন্যান্য ফরয কাজ যথারীতি পালনে নির্দেশ করা, উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারিতার প্রতি অনুপ্রাণিত করা। বিভিন্ন নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, উপকারমূলক জ্ঞান অর্জন। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾

আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং নিজেও তার ওপর অবিচল থাক।[৯]

ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

আর সে তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।[১০]

অনুরূপভাবে আবশ্যক হল আল্লাহ তাআলা মানুষের যে সকল কথা ও কাজে রাগান্বিত হন তা থেকে পরিবার-পরিজনকে নিষেধ করা, গুনাহ ও অশ্লীল কাজ এবং মিথ্যা বলা থেকেও বিরত থাকার আদেশ করা। বিশেষ করে স্ত্রী ও মেয়েদেরকে বেপর্দায় চলতে কঠোরভাবে নিষেধ করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে বলেছেন:

«من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار»

যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনো পরীক্ষা করা হবে সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড় হয়ে দাঁড়াবে।[১১]

দুই. আল্লাহর দুশমন কাফেরদের জন্য তিনি যে ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তার ইঙ্গিত এ আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। অত্র আয়াত কর্তৃক আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে আদম সন্তানের লাশ দ্বারা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের বিভীষিকাময় অবস্থা এবং এর কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন:

---

[৫] *আবূ দাউদ হা: ১৪৫০*
[৬] *সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত: ৯৮*
[৭] *তাবারী- ১/৩৮১*
[৮] *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীব তাফসীর ইবনে কাসীর-১৪২২ পৃ: দ্র:*
[৯] *সূরা ত্বহা আয়াত: ১৩২*
[১০] *সূরা মারইয়াম আয়াত: ৫৫*
[১১] *সহীহ বুখারী হা: ১৪১৮, সহীহ মুসলিম হা: ২৬২৯*

﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى ○ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ○ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ○ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾

কখনো নয়! এটি তো লেলিহান আগুন। যা মাথার চামড়া খসিয়ে নেবে। জাহান্নাম তাকে ডাকবে যে, সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রেখেছিল।[১২]

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ○ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ○ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾

কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। চামড়াকে দগ্ধ করে কালো করে দেবে।[১৩] আল্লাহ আরো বলেছেন:

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾

সেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? আর সে বলবে, আরো বেশি আছে কি?[১৪]

ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন:

«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»

জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন তাতে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা উহা টেনে নিয়ে যাবে।[১৫]

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন:

«ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا، من حر جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية، يا رسول الله قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، كلها مثل حرها»

তোমাদের এ অগ্নি যা আদম সন্তানগণ প্রজ্জ্বলিত করে তা জান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের একভাগ। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আল্লাহর কসম! এ আগুন যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেনঃ (তবুও) সে আগুনকে এ আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশি তাপমাত্রা সম্পন্ন করা হয়েছে। এর (উনসত্তরের) প্রতিটি গুণ তার তাপের (দুনিয়ার আগুনের) সমমানের।[১৬]

তিন. ফেরেশতামণ্ডলীর অস্তিতের প্রমাণ এবং এদের মধ্য থেকে কিছু রয়েছেন জাহান্নামের দায়িত্বশীল, যারা জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদান ও অপমান-অপদস্ত করার জন্য নিয়োজিত। যাদের সংখ্যা হল, আল্লাহ বলেছেন: عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ তার উপর রয়েছে ঊনিশ জন (প্রহরী)।[১৭]

চার. মু'মিন ব্যক্তির উচিৎ তার নফ্সকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করা। আর এ রক্ষা করাটা হতে পারে ন্যূনতম কোনো কল্যাণকর কাজ দ্বারা। আদী বিন হাতিম ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন:

«ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة»

তোমাদের প্রত্যেকেরই সাথে আল্লাহ নিশ্চয়ই কথা বলবেন। তাঁর ও বান্দার মাঝখানে কোনো দোভাষী থাকবে না। অতঃপর বান্দা তাঁর ডানদিকে তাকাবে, কিন্তু কৃতকর্মগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুই সে দেখবে না। এরপর বান্দা তার বামদিকে তাকাবে। কিন্তু কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর সামনের দিকে তাকাবে, কিন্তু চোখের সামনে সে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং এক টুকরা খেজুর সাদাকা করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ।[১৮]

প্রিয় পাঠকবর্গ! আসুন আমরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে প্রত্যেকেই নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন, আমীন ॥❑❑

---

[১২] *সূরা আল-মাআরিজ আয়াত: ১৫, ১৬, ১৭, ১৮*
[১৩] *সূরা আল-মুদ্দাস্সির আয়াত: ২৭, ২৮, ২৯*
[১৪] *সূরা ক্বাফ আয়াত ৩০*
[১৫] *সহীহ মুসলিম হা: ২৮৪২*
[১৬] *সহীহ মুসলিম হা: ২৮৪৩*
[১৭] *সূরা আল-মুদ্দাস্সির আয়াত: ৩০*
[১৮] *সহীহ মুসলিম হা: ১০১৬*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

মুহাররম ও আশুরার সিয়ামের ফযীলত

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

আবু হুরায়রাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম। আর ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত।[১৯]

ব্যাখ্যা: شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ "আল্লাহর মাস মুহাররম" এখানে মুহাররম মাসকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আর এ সম্বন্ধ পদ দ্বারা মুহাররম মাসকে সম্মানিত করা উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাসের সংখ্যা বারোটি। তার মধ্যে চারটি হল সম্মানিত মাস।[২০]

আর সম্মানিত চারটি মাস হচ্ছে "মুহাররম, রজব, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ"[২১]

আল্লামা আলকারী (রহমাহুল্লাহ) বলেন: شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ দ্বারা পুরা মুহাররম মাসের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। মুহাররম মাসের সিয়াম রমাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসের সিয়ামের চাইতেও মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও নাবী ﷺ রমাযান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসেই সম্পূর্ণ মাস সিয়াম পালন করেননি। এমন কি তিনি শা'বান মাসে যে রকম অধিক সিয়াম পালন করেছেন মুহাররম মাসে তেমন অধিক সিয়াম পালন করেননি। এর কারণ এমন হতে পারে যে, নাবী ﷺ-কে মুহাররম মাসের সিয়ামের এ ফাযীলাত সম্পর্কে তাঁর জীবনের শেষ দিকে অবহিত করা হয়েছিল যার কারণে তিনি আর মুহাররম মাসে অধিক সিয়াম পালনের সুযোগ পাননি। তবে তাঁর উম্মাতকে এ মাসের অধিক হারে সাওম পালনের জন্য উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ মাসের সিয়ামের ফাযীলত বর্ণনা করেছেন।[২২]

আশুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» ، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় আগমন করে ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিনে সিয়াম পালন করতে দেখে প্রশ্ন করলেন, এটা কী? (অর্থাৎ, এটা কিসের সিয়াম) তারা বলল, এটা একটি উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বাণী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে নাজাত দান করেন। তাই এ দিনে মূসা ﵇ সাওম পালন করেন। এ কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন: আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসা ﵇-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং তাঁর সহচরদেরকে সাওম পালনের নির্দেশ দেন।[২৩]

يَوْمٌ صَالِحٌ "একটি উত্তম দিন" মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ "ইহা একটি মহান দিন" فَصَامَهُ مُوسَى "এ দিনে মূসা ﵇ সাওম পালন করেন। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, شُكْرًا لله تعالى فَنَحْنُ نَصُومُهُ মূসা ﵇ আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দিনে সাওম পালন করেন। এ জন্যে আমরাও এ দিনে সিয়াম পালন করব।

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে

وَهَذَا اليَوْمُ الذى اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ، فَصَامَ نُوحٌ شُكْرًا .

---

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৯] সহীহ মুসলিম হা: ১১৬৩, আবূ দাউদ হা: ২৪২৯, তিরমিযী হা: ৪৩৮

[২০] সূরা তাওবাহ আয়াত: ৩৬

[২১] সহীহ বুখারী হা: ৪৬৬২

[২২] শারহুন নাবাবী-১১৬৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যা

[২৩] সহীহ বুখারী হা: ২০০৪

এটা এমন একটি দিন যেদিনে নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা জুদী পাহাড়ে স্থির হয়েছিল। ফলে নূহ (আলাইহিস সালাম) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঐ দিন সাওম পালন করেন।[২৪]

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জাহেলী যুগে কুরাইশগণ আশুরার দিনে সিয়াম পালন করত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও জাহেলী যুগে এ দিনে সিয়াম পালন করতেন। অতঃপর মদীনায় আগমন করার পরও তিনি এ দিনে নিজে সিয়াম পালন করেন এবং (অন্যকেও) এ সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। এরপর যখন রমাযানের সিয়াম ফরয করা হল তখন তিনি আশুরার দিনে সিয়াম পালন করা ছেড়ে দেন। অতএব, কেউ ইচ্ছা করলে সাওম পালন করবে আর কেউ চাইলে তা পরিত্যাগ করবে।[২৫]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: সম্ভবত কুরাইশগণ তাদের পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসরণে এ দিনে সিয়াম পালন করতেন। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা এ মতকে দৃঢ় করে। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহেলী যুগে এ দিনে সিয়াম পালনের কারণ এটা হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ দিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, এটা একটি কল্যাণজনক কাজ অথবা এটাও হতে পারে জাহেলী যুগে কুরাইশগণ যে রকম হজ্জ সম্পাদন করতো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সাথে সহমত পোষণ করে অনুরূপভাবে তিনি সিয়াম পালনের ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহমত পোষণ করেন।[২৬]

এ থেকে জানা যায় যে, আশুরার সিয়াম কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং তা সেই নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ থেকেই চলে এসেছে। অতএব ১০ মুহাররম তারিখে সিয়াম পালনের সাথে কারবালার ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

[২৪] *ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড ২৪৭ পৃ:*
[২৫] *সহীহ বুখারী হা: ২০০২*
[২৬] *ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড-২৪৮ পৃ:*

আশুরার সাওমের ফযীলত:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ»

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আশুরার দিনের সাওমের উপরে অন্য কোনো দিনের সাওমকে প্রধান্য প্রদান করতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ, রমাযান মাসের ওপর অন্য মাসকে গুরুত্ব প্রদান করতে দেখিনি।[২৭]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»

আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আরাফার দিবসের সাওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, (এ সিয়ামের বিনিময়ে) আল্লাহ পূর্ববর্তী এক বছরের এবং পরবর্তী এক বছরের (সগীরাহ) গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আশুরার সাওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, এতে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের (সগীরাহ) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[২৮]

এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, আরাফার সিয়ামের বিনিময়ে তিনি তার বান্দার পূর্ণ দুই বছরের সাগীরাহ গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আশুরার একদিনের সিয়ামের বিনিময়ে তিনি বান্দার পূর্ণ এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

আশুরার দিবস কোনটি?

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : আশুরা এবং তাসূ'য়া দুটি বিশেষ্য যা দীর্ঘ স্বরে পাঠ করা হয়। অভিধানের গ্রন্থসমূহে এটা একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। অতএব আশুরা হল মুহাররম মাসের ১০ তারিখ আর তাসূ'য়া হল মুহাররম মাসের ৯ তারিখ। জমহুর ওলামার এটাই অভিমত এবং হাদীসের প্রকাশমান অর্থও এটিই । আর ভাষাবিদদের নিকটও এটিই প্রসিদ্ধ।[২৯]

[২৭] *সহীহ বুখারী হা: ২০০৬*
[২৮] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৬২*
[২৯] *মাজমু*

আশুরা নামটি ইসলামী পরিভাষা। জাহেলী যুগের ভাষায় এ শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না।[৩০]

ইবনু কুদামাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: আশুরা হল মুহাররম মাসের ১০ম দিবস। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও হাসান বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দ্বয়ের এটাই অভিমত। কেননা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشرمن المحرم.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাররম মাসের ১০ম দিবসে আশুরার সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩১]

আশুরার দিবসের সাথে ৯ মুহাররমের তারিখে সিয়াম পালন করাও মুস্তাহাব।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আশুরার সিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে এ সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদ এবং নাসারাগণ এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ইন শা আল্লাহ আগামী বছর আমরা নয় তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যু ঘটে।[৩২]

ইমাম শাফিঈ, তার সহচরবৃন্দ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং অন্যান্য অনেকেই বলেন: মুহাররম মাসের নবম ও দশম এ দুদিনই সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশম দিনে সিয়াম পালন করেছেন। আর নবম দিনেও সিয়াম পালন করার আশা ব্যক্ত করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, ন্যূনতম পক্ষে মুহাররম মাসের দশম তারিখে সিয়াম পালন করা উচিৎ। তবে নবম ও দশম এ দুদিন সিয়াম পালন করা শ্রেয়। আর মুহাররম মাসে যত অধিক সিয়াম পালন করা যায় ততই ভাল।

৯ মুহাররমে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব হওয়ার হিকমত: ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: আলেমগণ মুহাররম মাসের নবম দিনে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব হওয়ার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. এ দ্বারা ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য।

২. যেহেতু শুধুমাত্র একদিন নফল সিয়াম পালন করা নিষেধ করা হয়েছে যেমন জুমুআর দিন, সেহেতু নবম তারিখে সিয়াম পালন করে আশুরার সাথে একদিন যুক্ত করা উদ্দেশ্য।

৩. যাতে মুহাররম মাসের দশম তারিখের সিয়াম কোন ভাবেই ছুটে না যায়। যেমন যিলহজ্জ মাস মূলত ২৯ দিনের হয়েছে, কিন্তু ঐ মাসের চাঁদের সঠিক হিসাব না রাখার কারণে তা ৩০ দিন গণ্য করা হয়েছে। এতে মুহাররমের নবম তারিখ আসলে দশম তারিখ। তাই নবম তারিখের সিয়াম পালন করার বিধান রাখা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ) বলেন: এসব কারণের মধ্যে প্রথমটি অধিক শক্তিশালী। আর তা হলো আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করা। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক হাদীসে তাঁর উম্মাতকে ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করতে বলেছেন।[৩৩]

" لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع " এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেঁচে থাকলে পরবর্তী বছর নয় তারিখে সিয়াম পালন করার কারণ এ হতে পারে যে, তিনি শুধুমাত্র নবম তারিখে সিয়াম পালন না করে বরং দশম তারিখের সাথে আরেকটি সিয়াম যুক্ত করতে চেয়েছিলেন যাতে ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করা হয়। অথবা তিনি চেয়েছিলেন যে, যাতে দশম তারিখের সিয়াম কোনভাবেই ছুটে না যায়।

---

[৩০] *কাশশাফুল কান্না ২য় খন্ড*
[৩১] *তিরমিযী হা: ৭৫৫*
[৩২] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৩৪*
[৩৩] *ফাতাওয়া কুবরা ৬ষ্ঠ খণ্ড*

শুধুমাত্র আশুরার দিনে সিয়াম পালন করার বিধান :

শাইখলু ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: আশুরার সিয়াম পালন করলে এক বছরের গোনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র আশুরার দিনে সিয়াম পালন মাকরূহ নয়।[৩৪]

ইবনু হাজার হায়তামী বলেন: এককভাবে আশুরার দিনে সিয়াম পালনে কোনো সমস্যা নেই।[৩৫]

শুক্রবার অথবা শনিবার আশুরার সিয়াম পালন করা:

ফরয সিয়াম ব্যতীত এককভাবে শুক্রবার অথবা শনিবার সিয়াম পালন করা মাকরূহ। তবে ঐ দু'দিনের সাথে যদি আগে বা পিছে আরেক দিন মিলিয়ে সিয়াম পালন করা হয় তবে তা মাকরূহ নয়। অনুরূপভাবে কোনো অভ্যাসগত সিয়াম যদি শুধু শুক্রবার অথবা শনিবারে পালন করা হয় তবে তা মাকরূহ নয়। যেমন নিয়মিত একদিন সিয়াম পালন করা এবং একদিন ভঙ্গ করা, অথবা মানতের সিয়াম পালন, অথবা কাযা সিয়াম পালন করা অথবা এমন সিয়াম পালন করা যা শরীয়াত তার অনুমতি দিয়েছে যেমন আরাফার দিনের সিয়াম এবং আশুরার দিনের সিয়াম। [৩৬]

যদি মাসের শুরু নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে আশুরার সিয়াম কিভাবে পালন করবে?

ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: যদি মাসের শুরু নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে (৮, ৯, ১০) তিন দিন সিয়াম পালন করবে। যাতে নবম ও দশম দিনের সিয়াম নিশ্চিত হয়।[৩৭]

অতএব, যে ব্যক্তি মুহাররম মাস শুরুর ব্যাপারে নিশ্চিত নয় অথচ সে আশুরার সিয়াম পালন করতে চায় তাহলে সে ৯ ও ১০ দুই দিন সিয়াম পালন করবে। আর যে ব্যক্তি ৯ ও ১০ দুই দিনের সিয়াম নিশ্চিত করতে চায় তাহলে সে ৮, ৯ ও ১০ তিন দিন সিয়াম পালন করবে। যেহেতু আশুরার সিয়াম ওয়াজিব নয় বরং তা মুস্তাহাব তাই মুহাররম মাসের শুরুর বিষয়ে লোকদেরকে তা অন্বেষণ করার জন্য তাকিদ করা যাবে না যেরকম, রমাযান ও শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার জন্য তাকিদ করা হয়।

[৩৪] *ফাতাওয়া কুবরা ৫ম খণ্ড*
[৩৫] *তুহফাতুল মুহতাজ ৩য় খণ্ড, নফল সিয়াম অধ্যায়*
[৩৬] *তুহফাতুল মুহতাজ ৩য় খণ্ড, নফল সিয়াম অধ্যায়*
[৩৭] *মুগনী ৩য় খণ্ড*

আশুরার সিয়াম দ্বারা কোন প্রকারের গুনাহ ক্ষমা হয়?

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: এ সিয়াম দ্বারা সকল প্রকার সগীরা গুনাহ মাফ হয়। অতঃপর তিনি বলেন: আরাফার দিনের সিয়ামের বিনিময়ে দুই বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়। আশুরার দিনের সিয়াম দ্বারা এক বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়। যদি সালাতের ভিতরে কারো আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, উল্লেখিত সকল আমলই গুনাহ মাফ হওয়ার উপযুক্ত আমল। অতএব, কারো ক্ষমাযোগ্য কোনো সগীরাহ গুনাহ থাকলে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। তবে তার যদি কোনো সগীরাহ গুনাহ না থাকে তবে এর বিনিময়ে তার জন্য সাওয়াব লিখা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। আর তার যদি সগীরাহ গুনাহ না থাকে তাহলে আমরা আশা করব যে, তার কাবীরাহ গুনাহ থাকলে তা হালকা করা হবে।[৩৮]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: অযূ, সালাত, রমাযানের সিয়াম ও আরাফাত এবং আশুরার সিয়াম দ্বারা যে গুনাহ ক্ষমা করা হয় তা শুধুমাত্র সাগীরাহ গুনাহ।[৩৯]

হাদীসের শিক্ষা :

১. মুহাররম মাস মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহের একটি।

২. রমাযানের সিয়ামের পরেই এ মাসের সিয়াম অনেক ফযীলতপূর্ণ।

৩. আশুরার দিনের সিয়াম দ্বারা এক বছরের সাগীরাহ গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৪. আশুরার সিয়াম মুস্তাহাব।

৫. আশুরার সাথে মুহাররম মাসের ৯ তারিখের সিয়াম পালনও মুস্তাহাব।

৬. শুধুমাত্র আশুরার দিনে সিয়াম পালন মুস্তাহাব যদিও তা শুক্রবার অথবা শনিবার হয়।

৭. মুহাররম মাসে অধিক হারে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। ❑❑

[৩৮] *শারহুল মুহাযযাব ৬ষ্ঠ খণ্ড*
[৩৯] *ফাতাওয়া কুবরা ৫ম খণ্ড*

সম্পাদকীয় স্বাগত হিজরী নববর্ষ ১৪৪৪ হিঃ الافتتاحية

আল-হামদু লিল্লাহ। আরবি ১৪৪৪ হিজরী সনের সূচনা হলো। দেখতে দেখতে আরো একটি বছর অতীতের পাতায় বিলীন হয়ে গেলো। সৃষ্টির শুরু থেকে মাস গণনার ধারাবাহিকতা চলমান। বারো মাসের হিসাবে বছর। যার মধ্যে চার মাস আশহুরে হুরুম বা মর্যাদাপূর্ণ মাস। হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররম। যাকে 'শাহরুল্লাহ' বা আল্লাহর মাস বলা হয়েছে। মুসা আলাইহিস সালামের লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আল্লাহর কৃপায় ফেরাউনের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য এ মাসের ১০ তারিখ ইতিহাসে 'আশুরা' দিবস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'আশুরা' অর্থ দশম। এ দিবসের একটি ঘটনার সাথে আরো অনেক ঘটনাকে জুড়ে দিয়ে সত্য-মিথ্যার মিশ্রন ঘটিয়েছে বিদ'আতীরা। তারা বলে থাকেন; আশুরার দিনে আকাশ-যমিন সৃষ্টি করা হয়েছে, আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টিও এ আশুরা দিবসে। তাঁদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণের তারিখও আশুরা দিবস। নবী নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন, নৌকায় আরোহণ, অবতরণ সবই আশুরা দিবসে। মুক্তিও লাভ করেছিলেন আশুরা দিবসে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর আগুনে নিক্ষেপ, আগুন থেকে মুক্তি-এ সবই ঘটেছে আশুরা দিবসে। নবী আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর রোগমুক্তি ও নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভের ঘটনাও এ আশুরা দিবসে। কিয়ামতও সংঘটিত হবে এই আশুরা দিবসে। এভাবে অসংখ্য কাকতালীয় ঘটনার আলোচনা পাওয়া যায় মাঠের মুখরোচক বক্তাদের কণ্ঠে। অথচ এ সবের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে। আমরা মনে করি, আলেমদের এসব ঘটনা বর্ণনায় আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আশুরা দিবসে নবী মুসা আলাইহিস সালাম মুক্তি পেয়েছিলেন ফেরাউনের হাত থেকে এটি সত্য এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঘটনা। এদিন সিয়াম পালন করা এক বছরের গুনাহ মাফের কারণ। ইহুদিরাও এদিন উৎসব করে বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বেশি রোযা রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এদিন আমরাও সিয়াম পালন করে এক বছরের গোনাহ মাফের সুযোগ নিতে পারি। তবে আগের দিন সহ মোট দু'দিন সিয়াম রাখতে পারলে উত্তম।

ঈদুল আজহার আগে ও পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যপী দ্রব্যমূল্য ব্যাপকভবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রীর দামে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। এ সময় সকল ক্ষেত্রে সংযমি হওয়া বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে হিসাবি হওয়া সময়ের দাবি। ইতোমধ্যে দেশে জ্বালানি সঙ্কটের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সবকারের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে কৃচ্ছতা সাধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের প্রভাবে ডিজেল-পেট্রোল-অকটেনসহ বিভিন্ন খাতে সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে মিতব্যয়ী হওয়া সকলের জন্যই কল্যাণকর। সঙ্কটকালে যেমন সহমর্মিতা, সহযোগিতা করার সুযোগ আছে, তেমনি এর বিপরীত চিত্রও আমরা দেখতে পাই। মজুতদারেরা অতিলাভের আশায় কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফায়দা লুটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিগত সময়ে আমরা বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ করোনার পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি। করোনার পাশাপাশি এবার আমরা জ্বালানি সঙ্কটের মুখোমুখি হতে চলছি। দু'আ করি, মুহাররম তথা শাহরুল্লাহর এই মর্যাদাপূর্ণ হারাম মাসে আল্লাহ যেন বিশ্বময় প্রশান্তি নামিয়ে সর্বব্যাপী অস্থিরতা থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেন। ১০ মুহাররমের কারবালার ঘটনায় প্রতিটি মুসলিম ব্যথিত মর্মাহত। কিন্তু তাই বলে মর্সিয়া-মাতম করার সুযোগ নেই এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে। এটাও বলব, যিনি যা করেছেন তিনি তার বদলা পাবেন। সুতরাং অহেতুক নেটজগতে ভাইরাল হওয়ার লোভে কারবালার ঘটনা নিয়ে বিতর্ক করে সীমাতিক্রম করা কারোর জন্যই কল্যাণকর নয়। পাশাপাশি এ কথাও বলব, মুহাররম মাস সহমর্মিতার মাস, পরস্পর সহযোগিতা ও ভালবাসা প্রদর্শনের মাস। কেননা এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ চারটি হারাম মাসের একটি। আসুন আমরা মর্সিয়া-ক্রন্দন, ভাবাবেগ পরিহার করে সঙ্কটময় এ সময়ে পরস্পর সংযমী হয়ে দেশের কল্যাণে, দশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দিন, আমিন! ❑❑

ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং তাওহীদ ও আকীদাহ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

(শেষ পর্ব)

তাওহীদ বর্ণনায় ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাওহীদের পরিচয়

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের পরিচয় :

৬. তাহরীফ, তা'বীল, তাকয়ীফ, তা'তীল ও তামসীল ছাড়াই বাহ্যিকভাবে সিফাতকে গ্রহণ করা :

সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মত হচ্ছে, আল্লাহর গুণাবলিকে কোনোরূপ তাহরীফ, তা'বীল, তাকয়ীফ, তা'তীল ও তামসীল ছাড়াই বাহ্যিকভাবে সাব্যস্ত করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه المقدسة في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ولا يعطلونها لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ورسله صادقون مصدقون.

"আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ হচ্ছে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ যে-সব গুণ দ্বারা আল্লাহকে গুণান্বিত করেছেন, সে-সব গুণের প্রতি ঈমান রাখা; কোনোরূপ তাহরীফ, তা'তীল, তাকয়ীফ, তামসীল ও তা'বীল ছাড়াই। তারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও উচ্চ গুণাবলির প্রতি। যে-সব সিফাত দ্বারা আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, তারা তা অস্বীকার করে না। কথাকে তার আসল জায়গা থেকে বিচ্যুত করে না। তাঁর নামসমূহ ও নিদর্শনসমূহে ইলহাদ করে না। ধরন বর্ণনা করে না। মাখলূকের গুণাবলির সঙ্গে তাঁর গুণাবলির উপমা দেয় না। অস্বীকার করে না। কেননা আল্লাহর সমকক্ষ, সমতুল্য ও শরিক কেউ নেই। মাখলূকের সঙ্গে কিয়াস করা যাবে না। কেননা তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৪০] তিনি আরো বলেন,

فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

"মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এসব সিফাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে কোনোরূপ তাহরীফ, তা'তীল, তাকয়ীফ ও তামসীল ছাড়াই।"[৪১]

৭. তাফবীয না-করা : আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফদের নীতি ছিল, কুরআন ও সুন্নায় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে মেনে নেওয়া। তারা তাফবীয থেকে দূরে থাকতেন। পরবর্তীতে কিছু লোক দাবি করে বসে যে, সালাফগণ তাফবীযে বিশ্বাসী ছিলেন তথা তারা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত নাম ও গুণাবলির অর্থ না-বুঝে শুধুমাত্র শব্দে বিশ্বাসী ছিলেন। ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাদের প্রতিবাদে বলেন,

ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله تعالى ورسوله منها وظاهرها تشبيه وتمثيل واعتقاد ظاهرها كفر وضلال وإنما هي ألفاظ لا معاني لها وإن لها تأويلا وتوجيها لا يعلمه إلا الله وأنها بمنزلة آلم و كهيعص وظن أن هذه طريقة

❖ *সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৪০] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৭*
[৪১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮*

যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বলতেন অথচ অর্থ জানতেন না। এটা চরম ভুল ও জঘন্য দুঃসাহস। এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।"[৪৪] তিনি আরো বলেন,

فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني

"কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞাত অর্থ সন্দেহের জালে আটকিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। তা প্রত্যাখ্যান করা মানে বাক্যসমূহকে তার মূল স্থান থেকে তাহরীফ করে ফেলা। এটাও বলা যাবে না, এসব শব্দের অর্থ বোধগম্য নয়, উদ্দেশ্য জানা যায় না। এরূপ করা মানে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা কিতাবকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরনে শেখে।"[৪৫]

২. নামে মিল থাকলেই তাশবীহ হয় না : যারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে তাদের মূল কারণ হচ্ছে, তারা মনে করে আল্লাহ তা'আলার ও মাখলূকের কোনো সিফাত ও বৈশিষ্ট্যের নাম এক হওয়া মানে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আর আল্লাহ মাখলূকের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। এ সাদৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য তারা সিফাতকে অস্বীকার করে। ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভুপালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের বিপরীতে বলেন,

وليس ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله تشبيها

"আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল আল্লাহকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা সাদৃশ্যদান নয়।"

তিনি তাদের ভুল ধারণার অপনোদন করে বলেন,

وأن ما جاء مما اطلقه الشرع على الخالق والمخلوق لا تشابه بينهم في المعنى الحقيقي إذ صفات القديم بخلاف صفات الحادث وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا

[৪৪] কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ৯৮-৯৯
[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

السلف ولم يكونوا يعرفون حقيقة قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله الرحمن على العرش استوى ونحو ذلك فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف وأضلهم عن الهدى وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة وكبار الذين كانوا أعلم الأمة علما وأفقههم فهما وأحسنهم عملا وأتبعهم سننا ولازم هذا الظن أن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه وهو خطأ عظيم وجسارة قبيحة نعوذ بالله منها

"যে ব্যক্তি মনে করে, 'গুণাবলি সংক্রান্ত দলিলের অর্থ অনুধাবন করা যায় না, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এর দ্বারা কী বুঝিয়েছেন, তা জানা যায় না। বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা সাদৃশ্য ও উপমা দেওয়ার নামান্তর। বাহ্যিক অর্থের ওপর বিশ্বাস রাখা কুফরি ও ভ্রষ্টতা। এসব শব্দের কোনো অর্থ নেই। এসব শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুধুমাত্র আল্লাহ জানেন। এসব শব্দ 'আলিফ লাম মীম' 'কাফ হা ইয়া আইন সোয়াদ' এর মতো।' তারা আরো মনে করে যে, 'এটাই সালাফদের তরীকা। তারা আল্লাহর বাণী– 'কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিন আল্লাহর কব্জায় থাকবে', 'আল্লাহ বললেন হে ইবলিস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম তাকে সিজদা করতে কীসে তোমাকে নিষেধ করল?'[৪২] ও 'রহমান আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন'[৪৩]–এর মতো আয়াতের হাকীকত জানতেন না।"

এমনটি দাবিকারী সালাফদের আকীদার ব্যাপারে সবচেয়ে জাহিল লোক এবং হিদায়াতের পথ থেকে সবচেয়ে বড় ভ্রষ্ট। এমন দাবির মাধ্যমে পূর্ববর্তী মুহাজির, আনসারসহ সকল সাহাবীদের এবং উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম আমলকারী ও সবচেয়ে বেশি সুন্নাহর পাবন্দ ব্যক্তিদের মতো সালাফদের জাহিল আখ্যায়িত করা হয়। এ দাবির মাধ্যমে আবশ্যক হয়ে যায়

[৪২] সূরা সোয়াদ আয়াত: ৭৫
[৪৩] সূরা ত্বহা আয়াত: ৫

এবং স্রষ্টা 'রউফ ও রহীম' সৃষ্টি 'রউফ ও রহীম' এর মতো নয়।...স্রষ্টা ও সৃষ্টির সিফাতের মধ্যে নাম ছাড়া কোনো কিছুতেই মিল নেই।"[৪৬]

কুরআন ও সুন্নায় অব্যবহৃত শব্দের ব্যাপারে ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অবস্থান

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আতের নীতি হচ্ছে, আকীদাহ ও তাওহীদের ক্ষেত্রে সেসব শব্দ ব্যবহার করতে হবে, যা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে কালামপন্থিদের কিছু বিদ'আতী ফিরকা আকীদাহ ও তাওহীদের ক্ষেত্রে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করা শুরু করে, যা কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায় না, যেমন–জিহাত, জাওয়ারিহ, আ'যা, জিসম, জাওহার, আ'রায ইত্যাদি। তাদের এসব মুজমাল বা অস্পষ্ট শব্দের ব্যাপারে ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قالها أحد من أئمة المسلمين كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك.

"তাদের ভ্রষ্টতার মূল কারণ হলো, এমন সব মুজমাল বা অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা, যা না কুরআনে পাওয়া যায়, না হাদীসে পাওয়া যায় আর না কোনো ইমাম তা ব্যবহার করেছেন। যেমন–তাহাইউয, জিসম, জিহাত ও এ জাতীয় শব্দ।"[৪৭]

এমন সব শব্দের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে : সরাসরি অস্বীকার করব, না সরাসরি সাব্যস্ত করব, না অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করব?–এ ব্যাপারে ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

واما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل في جهة وهو متحيز أو ليس بمتحيز ونحوها من الألفاظ التي تنازع فيها الناس فليس مع احدهما نص لا عن الرسول ولا عن الصحابة التابعين لهم باحسان ولا أئمة المسلمين فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله موافقة اللفظ للفظ والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فإذا كانت هذه المخلوقات الفانية ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقهما في الأسماء فالخالق جل وعلا أعظم علوا وأعلى مباينة لخلقه من مباينة المخلوق للخالق وإن اتفقت الأسماء وأيضا فقد سمى الله سبحانه نفسه حيا عليما سميعا بصيرا ملكا رؤوفا رحيما وسمى بعض مخلوقاته حيا وبعضها عليما وبعضها سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف الرحيم كالرؤوف الرحيم... وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم.

"শারীআত স্রষ্টা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে একই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছে, বাস্তব অর্থে উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। অনাদি বৈশিষ্ট্য আর আদি বৈশিষ্ট্য একরকম হয় না, ভিন্ন ভিন্ন হয়। আল্লাহর ও বান্দার সিফাতের মধ্যে শুধুমাত্র শব্দগত মিল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, জান্নাতে গোশত, দুধ, মধু, পানি, রেশম ও স্বর্ণ রয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের এসব বস্তুর মধ্যে শুধু নামে মিল রয়েছে। নাম এক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া ও আখিরাতের বস্তুর মধ্যে যদি মিল না-থাকে, তবে নাম এক হলে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে মিল না-থাকা বরং ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আরো যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজের নাম দিয়েছেন হাই, আলীম, সামী', বাসীর, মালিক, রউফ ও রহীম। অপরপক্ষে কোনো সৃষ্টির নাম দিয়েছেন হাই, কোনো সৃষ্টির নাম দিয়েছেন আলীম, কোনো সৃষ্টির নাম দিয়েছেন সামী' ও বাসীর, আর কোনো সৃষ্টির নাম দিয়েছেন রউফ ও রহীম। তাই বলে স্রষ্টা 'হাই' সৃষ্টি 'হাই' এর মতো নয়, স্রষ্টা 'আলিম' সৃষ্টি 'আলিম' এর মতো নয়, স্রষ্টা 'সামী' সৃষ্টি 'সামী' এর মতো নয়, স্রষ্টা 'বাসীর' সৃষ্টি 'বাসীর' এর মতো নয়

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩
[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

في جهة ولا قال ليس هو في جهة ولا قال هو متحيز بل ولا قال هو جسم أو جوهر ولا قال ليس بجسم ولا جوهر فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا فمن أراد معنى صحيحا موافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منه وإن أراد معنى فاسدا مخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردودا عليه فإذا قال القائل إن الله في جهة قيل له ما تريد بذلك أتريد أنه سبحانه في جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون في جوف السموات أم تريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه العالي بل هو العالي المحيط بها.

"আল্লাহর নাম ও গুণ সাব্যস্তকরণ ও নাকচকরণের ক্ষেত্রে নতুন শব্দ, যেমন, বলা জিহাত বা দিক, আল্লাহ সীমাবদ্ধ, না সীমাবদ্ধ নন। এসব শব্দ নিয়ে মানুষ পরস্পরবিরোধী। তাদের কারো পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই; রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবী, তাবিয়ী এবং ইমামদের থেকে প্রমাণ নেই। কারণ, তাদের কেউ বলেননি, আল্লাহ অমুক দিকে আছেন বা আল্লাহ অমুক দিকে নেই। তারা বলেননি, তিনি সীমাবদ্ধ, দেহবিশিষ্ট্য, মৌলিক। এসব শব্দ কুরআনে নেই, হাদীসে নেই এবং ইজমায় নেই। যারা এসব শব্দ ব্যবহার করেন, তারা কখনও সঠিক অর্থ উদ্দেশ্য নিতে পারেন আবার কখনও ভুল ও ভ্রান্ত অর্থ উদ্দেশ্য নিতে পারেন। যে-ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে সঠিক অর্থ উদ্দেশ্য নিবে, তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে-ভ্রক্তি কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী ভুল ও ভ্রান্ত অর্থ উদ্দেশ্য নিবে, তার কথা প্রত্যাখ্যাত হবে। যদি কেউ বলে, আল্লাহ অমুক দিকে রয়েছেন। তাকে বলতে হবে, এর মাধ্যমে আপনার উদ্দেশ্য কী? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, এ অস্তিত্বশীল কোনো একদিক আল্লাহকে ঘিরে আছে ও বেষ্টন করে আছে, যেমন–তিনি আসমানসমূহের ভিতর আছেন? না-কি আপনার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল দিকের উর্ধ্বে অনস্তিত্ব দিকে আছেন অর্থাৎ, সৃষ্টিজগতের ওপরে আছেন? কেননা সৃষ্টিজগতের ওপরে কোনো সৃষ্ট বস্তু নেই। যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, অস্তিত্বশীল দিক, তবে আপনি আল্লাহকে সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন। আর আল্লাহকে সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা বাতিল আকীদাহ। আর যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, অনস্তিত্ব দিক অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের উর্ধ্বে, সৃষ্টিজগতের বিপরীতে, তাহলে আপনার কথা সঠিক ও সত্য। এতে প্রমাণিত হয় না যে, তাঁকে কোনো সৃষ্টবস্তু ঘিরে রেখেছে, বেষ্টন করে আছে এবং তাঁর ওপরে কোনো কিছু আছে; বরং প্রমাণ হয় তিনি সবার উর্ধ্বে এবং সবকিছুকে বেষ্টনকারী।"[৪৮]

কিছু নাম ও সিফাত, যা ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় নাম ও গুণ সাব্যস্ত করতেন। তিনি এতে কোনো তা'বীল, তা'তীল, তামসীল, তাশবীহ তাকয়ীফ ও তাহরীফের আশ্রয় নিতেন না। এর প্রমাণস্বরূপ নিম্নে আল্লাহ তা'আলার কিছু নাম ও গুণ নিয়ে আলোচনা করা হলো যেগুলো তিনি সাব্যস্ত করেছেন।

হাত : আল্লাহর 'হাত' সাব্যস্ত করার জন্য তিনি স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদ রচনা করেন। তিনি বলেন–

إثبات اليدين لله عز وجل

وأما قوله تعالى يد الله فوق أيديهم فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع ...

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لأدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة وقد صح عن النبي ....

[৪৮] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩; আদ-দ্বীনুল খালিস, খ. ১, পৃ. ৭৩*

সুমহান আল্লাহর দু'হাত সাব্যস্তকরণ :

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপরে।"[৪৯] জেনে রেখো, হাত (ইয়াদ) শব্দ কুরআনে তিনভাবে এসেছে।.....

যদি 'হাত' দ্বারা 'কুদরত' উদ্দেশ্য হয়, তবে হাতের কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে না। আদম (আলাইহি)-এর শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না তাদের ওপর যাদেরকে আল্লাহ কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।...[৫০] এরপর তিনি 'হাত' এর পক্ষে প্রমাণাদি পেশ করেন।

চেহারা: ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আল্লাহর 'চেহারা' সাব্যস্ত করতে বলেন,

ومما صح به النقل من الصفات "الوجه"، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه.

"যেসব গুণের ব্যাপারে সহীহ বর্ণনা এসেছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'চেহারা'। আল্লাহ বলেন : 'প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল, একমাত্র তাঁর 'চেহারা' ব্যতীত।"[৫১]

নাফস : তিনি আল্লাহর 'নাফস' সাব্যস্ত করতে বলেন,

ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس

"যেসব গুণের ব্যাপারে কুরআন কথা বলেছে এবং সহীহ বর্ণনা এসেছে, তন্মধ্যে একটি হলো 'নাফস'।..."[৫২] এরপর তিনি 'নাফস' এর পক্ষে প্রমাণাদি পেশ করেন।

কালাম বা কথা : তিনি আল্লাহর কালাম বা কথা প্রমাণ করতে বলেন,

ومن مذهب أهل الحق ومما اتفق عليه أهل التوحيد والصدق أن الله لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب.

"আহলুল হকের নীতি এবং তাওহীদ ও সত্যপন্থিগণ যে ব্যাপারে একমত, তা হলো- আল্লাহ অনাদিভাবে কথা বলেন। সেকথা শোনা যায়, বোঝা যায় ও লেখা যায়।..."[৫৩] এরপর তিনি 'কালাম বা কথা' এর পক্ষে প্রমাণাদি পেশ করেন।

আল্লাহর উলূ বা ঊর্ধ্ব হওয়া : সালাফদের ইজমাপূর্ণ আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ঊর্ধ্বে আরশের ওপর সমুন্নত। ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আল্লাহ সবকিছুর ঊর্ধ্বে আরশের ওপর সমুন্নত প্রমাণ করার জন্য অনেক দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন,

فهذه سبعة مواطن أخبر فيها بأنه سبحانه استوى على العرش وفي هذه المسألة أدلة من السنة والآثار الصحيحة الكثيرة يطول بذكرها الكتاب فمن أنكر كونه سبحانه في جهة العلو بعد هذه الآيات والأخبار فقد خالف الكتاب والسنة.

"এই সাত স্থানে আল্লাহ জানিয়েছেন, তিনি আরশের ওপর সমুন্নত। এ ব্যাপারে সুন্নাহ ও সহীহ হাদীস থেকে অনেক দলিল রয়েছে, যা উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। এসব আয়াত-হাদীসের পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহূ তা'আলার ঊর্ধ্বে হওয়াকে অস্বীকার করে, সে কিতাব ও সুন্নার বিরোধিতা করল।[৫৪]

এছাড়া তিনি আরো যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন, তা হলো : আল-কাদির, আল-খালিক, আল-বারী, আল-মুসাওয়ির, আল-হাই, আল-কাইউম, আল-আলীম, আল-বাসীর, আল-মুহসিন, আল-মুনঈম,আল-জাওয়াদ, আল-মু'তী, আল-নাফি', আয-যর, আল-মুকাদ্দিম, আল-মুআখখির, আল-মালিক, আর-রঊফ, আর-রহীম, আসা, নিকটবর্তী হওয়া, ডান, আঙুল, পা, চোখ, অবতরণ করা, পেণ্ডলী, শক্তি, ওপর, হাসা, আশ্চর্য হওয়া, ভালোবাসা, অপছন্দ করা, রাগান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, রেগে যাওয়া, জ্ঞান, হায়াত, ক্ষমতা, ইচ্ছা, চাওয়া, সঙ্গে থাকা, খুশি হওয়া, হিদায়াতদাতা, ভ্রষ্টকারী ইত্যাদি।[৫৫]

---

[৪৯] *সূরা ফাতহ আয়াত: ১০*
[৫০] *কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ১০১-১০৪*
[৫১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫*
[৫২] *প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩*
[৫৩] *প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২৯*
[৫৪] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪*
[৫৫] *কাতফুস সামার, পৃ. ৯২-৯৪, ১১৩-১১৮; আদ-দ্বীনুল খালিস, খ. ১, পৃ. ৩৮*

অমুসলিমদের উর্দূ ভাষায় আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরার অনুবাদ[৫৬]

প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী❖

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ হতেই বিশ্ব ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদের সূচনা হয়। বিশিষ্ট দুভাষী পণ্ডিত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রা. পারস্যবাসীদের জন্য ফার্সী ভাষায় সূরা আল-ফাতিহা অনুবাদ করেন। ফার্সী ভাষায় আল-কুরআনের সূরা আল-ফাতিহা অনুবাদের মাধ্যমে একদিকে যেমন আল-কুরআনের অনুবাদের সূচনা হয় তেমনি বিশ্ব ভাষা ও ফার্সী ভাষাতেও আল-কুরআন অনুবাদের সূত্রপাত ঘটে। বিশ্ব ভাষায় উর্দূ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে। উর্দূ ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো-আর্য শাখার ভাষা। পাকিস্তানে প্রায় ১ কোটি এবং ভারতে প্রায় ৫ কোটি লোকের মাতৃভাষা উর্দূ। এছাড়াও এ ভাষাটির প্রচলন দেখা যায় আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহর ও পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলির শহর এলাকায়। বিশ্বে উর্দূ ভাষাতেই সবচেয়ে বেশি আল-কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরকর্ম সম্পাদিত হয়েছে বলে বিভিন্ন গ্রন্থের সূত্রে জানা যায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন বিভাগের পিএইচডি গবেষক ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ তাঁর বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে মওলানা মহিউদ্দীন খান সম্পাদিত কুরআন পরিচিতি গ্রন্থের বরাতে উর্দূ ভাষায় ১৬৯টি পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক ২৫০ মিলিয়ে ১৫০০ আল-কুরআন অনুবাদ হয়েছে মর্মে তথ্য প্রদান করেছেন।[৫৭] কিন্তু এ গ্রন্থে বাস্তবে পাওয়া গেছে ৩ শতাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং আংশিক ৪৭০-এর অধিক।[৫৮] গোলাম ইয়াহইয়া আঞ্জুম স্বীয় কুরআনে কারীম কে হিন্দুস্তানী তারাজেম ও তাফাসীর কা এজমালী জাইযা গ্রন্থে উর্দূ ভাষার অনুবাদক ২৪০ জন পূর্ণাঙ্গ ও ৩৬৫ জন আংশিক বলে উল্লেখ করেছেন। দিল্লী ইসলামিক ওভারস ব্যুরো থেকে প্রকাশিত জাইযাতি তারাজিমে কুরআনী গ্রন্থে ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত 'কুরআন পরিচিতি' গ্রন্থে উর্দূ ভাষার অনুবাদক ৯২ জনের কথা উল্লেখ আছে।[৫৯] মুফাখখার হোসাইন ৪৬০টি[৬০] এবং উইকিপিডিয়ায় উর্দূ ভাষায় আল-কুরআন অনুবাদ সংখ্যা ৬১টির কথা উল্লেখ আছে।[৬১] এ ভাষায় আল-কুরআনের প্রথম অনুবাদ করেন ১৭৭৬ সালে শাহ রাফিউদ্দীন দেহলভী। এটি ১৮৪০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৬২] অমুসলিমদের মধ্যে উর্দূ ভাষাতে অনেকেই আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক অথবা বিভিন্ন সূরার অনুবাদ করেছেন, এদের সংখ্যা হল ২৪ জন। নিম্নে এদের নাম এবং তাদের কৃত বিভিন্ন সূরার অনুবাদ উল্লেখ করা হল–

১. ফকীর মুহাম্মদ হোসাইন খান, সূরা আল ইখলাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী হতে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়।[৬৩]

২. আবুল হাসান নানুতভী, সূরা আন-নাযিয়াত উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী হতে ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় ।[৬৪]

৩. মুহাম্মদ আবুল হাসান নানুতুভী, সূরা আল-ফীল উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লীর মাতবাআ মুজতাবা হতে ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়।[৬৫]

---

[56] *উইকিপিডিয়া।*

❖ *আল-কুরআন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। ও উপদেষ্টা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[57] *মহিউদ্দীন খাঁন সম্পাদিত, কুর'আন পরিচিতি, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ- ১৫৫।*

[58] *ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আলকুরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা বাংলাদেশ, ২য় সং, ২০০৯, পৃ- ৪১-৫৬।*

[59] *গোলাম মুহাম্মদ আঞ্জুম, কুরআনে কারীম কী হিন্দুস্তানী তারাজিম আওর তাফাসীর কা ইজমালী জাইযা, কওমী কাউন্সিল, নয়া দিল্লী, ২০১৭পৃ-১৬৯-৭০; কুরআন পরিচিতি, পৃ-৫০৩।*

[60] *Dr. Mofakkhar Hussain Khan, History of the printing the Holy Quran Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1988, p- 460-596; আব্দুল কাদির দেহলভী, জাইযাতি তারাজিমে কুরআনী, ইসলামিক ওভারস ব্যুরো, ১ম সং ১৯২২ এবং ২য় সং ২০১১, পৃ-১৭-৮৭ ও ২১৫।*

[61] *কুরআনে কারীম কে হিন্দুস্তানী তারাজেম ও তাফাসীর কা এজমালী জাইযা: পৃ-১৬৯-৭০; Dr. Mofakhkhar Hussain Khan, p- 460-596; জাইযাতি তারাজিমে কুরআনী, পৃ-১৭-৮৭ ও ২১৫।*

[62] *Ismet Binark Haliteren, World Bibliography Of Translations The Mineanings Of The Holy Quran (Istanbul: 1986).p-533.*

[63] *Dr. Mofakkhar Hussain Khan, Ibid, p- 582.*

[64] *Ibid, p- 579.*

৪. আব্দুল হক, আল-বুরুজ উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী হতে প্রকাশিত হয়।[৬৬]

৫. মুস্তাক আহমদ, উর্দূ ভাষায় সূরা আল-আলা, অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী প্রকাশিত হয়।[৬৭]

৬. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, সূরা আল-ইখলাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লীর শামসুল মাতবাআ হতে ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়।[৬৮]

৭. মুহাম্মদ ফিরুজ উদ্দীন, সূরা আদ-দুহা উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মাতবাআ মুফীদে আম লাহোর হতে ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়, ।[৬৯]

৮. আব্দুল আহাদ আব্দুল ওয়াহাব, সূরা আল-ইনশিরাহ উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী হতে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় ।[৭০]

৯. মুহাম্মদ আবুল হাসান নানুতুভী, সূরা আল-কাওছার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লীর মুজতাবা প্রেস হতে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় ।[৭১]

১০. শেখ রইছ বু আলী সীনা, সূরা আল-ইখলাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লীর মুজতাবা প্রেস হতে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৭২]

১১. মুহাম্মদ আব্দুল কাদের সিদ্দীকী, সূরা আল-ইনশিরাহ উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লীর আফযালুল মাতাবী হতে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়।[৭৩]

১২. হাকিম সৈয়দ শামসুল কাদরী হায়দরাবাদী, সূরা আল-ইখলাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মুজতাবা প্রেস, হায়দরাবাদ হতে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়, ।[৭৪]

১৩. আব্দুস সাত্তার, সূরা আদ-দুহা উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি লাহোর হতে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।[৭৫]

১৪. মুহাম্মদ আইয়ূব দেহলভী, সূরা আত-তীন উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মাকতাবা রাযী, করাচি হতে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।[৭৬]

১৫. মাযহার উদ্দীন চিরকুটী গং, সূরা আত-তীন উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মুহাম্মদ শরীফ তাজির কিতাব, লাহোর হতে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।[৭৭]

১৬. আব্দুর রাজ্জাক মালিহাবাদী, সূরা আল-কাওছার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী হতে ১৯২৫ সালে আল-হেলাল বুক এজেন্সী, লাহোর প্রকাশিত হয়।[৭৮]

১৭. জনকৈ ব্যক্তি, সূরা আল-ইখলাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি হতে ১৯২৩ সালে নওয়াল কিশোর লখনৌ থেকে প্রকাশিত হয়।[৭৯]

১৮. গোলাম রব্বানী সূরা আল-ইখলাস (মূল ইবন তাইমিয়া) উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী হতে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৮০]

১৯. মুহাম্মদ সাদাত আলী খান, সূরা আন-নাবা উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মাতাবাআ করিমী, হায়দরাবাদ হতে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।[৮১]

২০. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, আল-ফালাক ও নাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি আল-হিলাল বুক এজন্সি, লাহোর হতে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।[৮২]

২১. আনওয়ারুল হক আলাভী, আল ফালাক ও নাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি ইত্তিহাদ প্রেস, লাহোর হতে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।[৮৩]

২২. কাসিম মুহাম্মদ নানুতভী, আল ফালাক ও নাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দেওবন্দ হতে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।[৮৪]

---

65 *Ibid, p- 581.*
66 *Ibid, p- 579.*
67 *Ibid, p- 579.*
68 *Ibid, p- 582.*
69 *Ibid, p- 580.*
70 *Ibid, p- 580.*
71 *Ibid, p- 582.*
72 *Ibid, p- 582.*
73 *Ibid, p- 580.*
74 *Ibid, p- 582.*
75 *Ibid, p- 580.*
76 *Ibid, p- 580.*
77 *Ibid, p- 580.*
78 *Ibid, p- 582.*
79 *Ibid, p- 582.*
80 *Ibid, p- 582.*
81 *Ibid, p- 579.*
82 *Ibid, p- 583.*
83 *Ibid, p- 583.*

২৩. মুহাম্মদ ইসহাক সিদ্দীকী (১৯১৩-১৯৭৭) আল ফালাক ও নাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মজলিসুদ দাওয়া ওয়া তাহকীকে ইসলামী, করাচি হতে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় ।[৮৫]

২৪. আব্দুল বাসীর শিরহারুভী, সূরা আল-ফীল উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী হতে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়।[৮৬]

২৫. হাসান আলী মালিক, সূরা আল-ইখলাস উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লীর মুসলিম প্রিন্টিং প্রেস হতে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় ।[৮৭]

২৬. আব্দুল বারী, সূরা আল-আসর উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি ইদারা মজলিসে ইলমী, করাচি হতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।[৮৮]

২৭. হাকীম মুহাম্মদ সাদিক, সূরা আল-কাওছার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মাকতাবা কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, শিয়ালকোট হতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় ।[৮৯]

২৮. আহমদ, সূরা আল-কাওছার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি আর্ট প্রেস, লাহোর হতে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৯০]

২৯. ইসরার আহমদ, সূরা আল-আসর উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী, আঞ্জুমান খুদ্দাম আল-কুরআন, লাহোর হতে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৯১]

৩০. মুহাম্মদ আশরাফ শিয়ালাভী, সূরা আল-কাওছার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী মাকতাবা কাদেরিয়া, লাহোর হতে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৯২]

৩১. খালিসুদ্দওলা নাদির হোসাইন, সূরা আল-কাওছার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন।

৩২. আহমদ আলী, সূরা আল-আলাক উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী সিদ্দীকী ট্রাস্ট, করাচি হতে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৯৩]

৩৩. মুহাম্মদ হুসাইন ফারুক, সূরা আল-কদর উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি মাতবাআ তুহফা - ই- হিন্দ হতে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৯৪]

৩৪. অজ্ঞাত আব্দুল হাদী, সূরা আল-কদর উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী মাতবাআ তুহফা - ই- হিন্দ হতে সালে প্রকাশিত হয়।[৯৫]

৩৫. জনৈক, সূরা আল-আসর উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি রেসালা ই-পেশওয়া হতে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়।[৯৬]

৩৬. ইসরার আহমদ, সূরা আল-আসর উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী আঞ্জুমান খুদ্দাম আল-কুরআন, লাহোর হতে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৯৭]

৩৭. নকী আলী খান, সূরা আল-ইনশিরাহ উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদটি দিল্লী ইদারা তানসিফী, করাচি হতে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।[৯৮]

৩৮. জনৈক ব্যক্তি, সূরা আল-কাওছার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদটি মাতবাআ রিয়াদ, আমরুহা হতে সালে প্রকাশিত হয়।[৯৯]

আল-কুরআনের আম্মপারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ পারার অধিকাংশ সূরাই সালাতে তেলাওয়াত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এ পারার অর্থ জানার বিষয়ে মুসলিমদের আগ্রহ বেশি হওয়ায় এ পারার একেবারে কম অনুবাদ হয়নি। এদের সংখ্যা যে একবোরে নগণ্য নয় তা উপরের আলোচনা হতে সম্যক অভিহিত হতে পেরেছি। এতদবিষয়ে এমফিল পিএইচডি গবেষণা হতে পারে বলে প্রাজ্ঞজনদের ধারণা।❑❑

84 *Ibid, p- 583.*
85 *Ibid, p- 583.*
86 *Ibid, p- 581.*
87 *Ibid, p- 583.*
88 *Ibid, p- 581.*
89 *Ibid, p- 582.*
90 *Ibid, p- 582.*
91 *Ibid, p- 581.*
92 *Ibid, p- 582.*
93 *Ibid, p- 581.*
94 *Ibid, p- 581.*
95 *Ibid, p- 581.*
96 *Ibid, p- 581.*
97 *Ibid, p- 581.*
98 *Ibid, p- 580.*
99 *Ibid, p- 582.*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষণ্নতা

ড. আব্দুল্লাহ আল খাত্বের
অনুবাদ: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী*

(৩য় পর্ব)

ইতপূর্বে আমরা চিন্তা ও বিষণ্নতার কারণসমূহের বাহ্যিক কারণগুলো আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে আমরা অভ্যন্তরীণ কারণগুলো উল্লেখ করবো। **(২) অভ্যন্তরীণ কারণ** - অভ্যন্তরীণ কারণগুলো মূলত বংশীয় ও শারীরিক গঠনের সাথে সম্পর্কিত, মস্তিষ্কের কোষ বা জেনেটিক জৈব গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(ক) বংশীয় কারণ: চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কিছু মানুষ বংশগত কারণে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়ে হতাশায় ভুগে থাকেন। এটি বংশীয়ভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় তা ছড়িয়ে পড়ে।

(খ) শারীরিক সমস্যা: তেমনিভাবে শারীরিক সমস্যা যেমন: থাইরয়েড হরমোনের অভাব মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে। সেই সাথে ভিটামিন বি-১২ এর অভাব।

(গ) অস্পষ্ট কারণসমূহ: উপরোক্ত দুটি কারণ ছাড়াও চিন্তা ও বিষণ্নতার কিছু অজ্ঞাত কারণ রয়েছে। এ ব্যাপারে গবেষণার মাধ্যমে কিছু কারণ উদ্ঘাটিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অদ্যাবধি কিছু কারণ অস্পষ্ট রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিষণ্নতা শুধুমাত্র বিপদাপদ মুসিবত ও বাহ্যিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অন্যান্য কারণও রয়েছে। এছাড়াও কিছু মানুষ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষের ঈমান আমলের ত্রুটি ও ঘাটতির কারণেই হতাশা ও বিষণ্নতা গ্রাস করে এবং পর্যায়ক্রমে তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরূপভাবে মানুষ আরো কিছু ধারণা ও মত ব্যক্ত করে যা সঠিক নয়। ভুল সিদ্ধান্তের ইস্যুটি আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে পরিচালিত করে যা আমি অনেক হতাশাগ্রস্ত রোগীদের সাথে সাক্ষাতকালে তাদের মাঝে এটি লক্ষ্য করেছি। এটি তাদের অনেকের জন্যই একটি বড় সমস্যা। এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা তারা মনে করে নিষেদ অথচ তা আইনগতভাবে জায়েয। আবার এমন কিছু আচরণ বা অনিচ্ছাকৃত কর্ম রয়েছে যার দরূণ আল্লাহ বান্দাদেরকে জবাবদিহি করেন না।

যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা চলাফেরা, অনুভূতি ইত্যাদির ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করা হবে না। যেমন: হৃদয়ের সংকীর্ণতা, অশ্রুসিক্ততা অথবা চিন্তা-ভাবনা যা হৃদয়ে উদ্রেক হয়। এ ব্যাপারে বান্দার কোন ক্ষমতা থাকে না এবং সে বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। রাসূল ﷺ বলেন,

"إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ."

আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের হৃদয়ে উদ্রেক হওয়া বিষয় ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তার মুখ দিয়ে ব্যক্ত করে অথবা কার্যে পরিণত করে।[১০০]

সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত হাদীস: অতএব, কোন মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, তবে সে কারণে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। একদা রাসূল ﷺ-এর এক নাতির মৃত্যু যন্ত্রণায় তিনি অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি দয়া বা করুণার নিদর্শন যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন।[১০১]

অপরদিকে মানুষের কথা বা আমল এবং আচরণ যে ব্যাপারে সে ক্ষমতাবান সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং হিসাব নেয়া হবে।[১০২] যেমন গাল চাপড়ানো,

* শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও কর্মকর্তা, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।

[১০০] সহীহ বুখারী, তালাক্ব অধ্যায়: ৬/১৬৮, ১৬৯ ও সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় হা: ১/১১৬, ১১৭।
[১০১] সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়: অসুস্থ ব্যক্তির নিকট ক্রন্দন পরিচ্ছেদ, ২/৮৫, ও সহীহ মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তির নিকট ক্রন্দন, হা: ২/৬৩৬।
[১০২] সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়: ২/৭৯, ৮০, ও সহীহ মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তির নিকট ক্রন্দন, হা: ২/৬৩৬।

চিৎকার করে ক্রন্দন, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মৃত্যু কামনা মূলক কোন বাক্য উচ্চারণ করা ইত্যাদি। তাকদীরের লিখনের বিপরীত মত পোষণ করা, আত্মহত্যা করা বা আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালানো সবই গর্হিত কাজ ও পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত বিষয়ের দলীল প্রমাণ, রাসূল ﷺ বলেন:

لَيسَ مِنَّا من ضَرَبَ الْخُدُودَ، وشَقَّ الْجُيُوبَ، ودعا بِدَعْوَى الجاهلية.

অর্থাৎ 'সে আমার আদর্শের অন্তর্ভূক্ত নয়, যে ব্যক্তি গাল চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়াতের আচরণ করে।' [১০৩]রাসূল ﷺ আরো বলেন:

"لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي"

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন তার ওপর বিপদ পতিত হলে মৃত্যু কামনা না করে। যদি তাকে তা করতেই হয় সে যদি এরূপ করতে বাধ্য হয় তবে সে যেন বলে- হে আল্লাহ, আমার জন্য জীবন যতদিন কল্যাণকর, সে পর্যন্ত আমাকে হায়াত দান কর এবং মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর, তখন আমাকে মৃত্যু দাও।[১০৪]

খাব্বাব ﷺ সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলেন: রাসূল ﷺ আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করলে আমরা মৃত্যু কামনা করতাম। কোনো প্রাণ হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾

অর্থ: তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।[১০৫]

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে নবী করীম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,

"مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا فِيهَا أَبَدا. وَمَنْ شَرِبَ سَمّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا فِيهَا أَبَدا. وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا فِيهَا أَبَدًا."

যে ব্যক্তি নিজেকে কোন ধারালো কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে কেউ পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করবে।[১০৬]

উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, আত্মহত্যার জন্য আত্মহত্যাকারী নিজেই দায়ী এবং যে শাস্তির বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা তাকে ভোগ করতে হবে। পৃথিবীতে মূলত তীব্র হতাশা, দুর্বল মানসিকতা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে অসংখ্য মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আত্মহত্যার বিষয়টি শরীয়তের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধিমালার আলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ যাই হোক না কেন, এসবের মুল বিচারের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার হাতে। তবে, জীবন সমস্যার যাবতীয় সমাধান ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে। সেহেতু সমস্যা যত প্রকটই হোক না কেন, ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বনের মাধ্যমে তা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোনভাবেই নিরাশা ও হতাশাকে মনে স্থান দেয়া যাবে না।

[সাম্প্রতিককালে এটি একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। মান -অভিমান, নিঃসঙ্গতা ও নানা সমস্যা এবং জ্ঞানের স্বল্পতা ও ধৈর্যের ঘাটতির কারণে বিভিন্ন অজুহাতে মানুষ আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেশি। **(বাকী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

[১০৩] *সহীহ বুখারী হা: ২/৮২, ৮৩।*
[১০৪] *সহীহ বুখারী, রোগী অধ্যায় হা: ৭/১০, ১৫৫*
[১০৫] *সূরা আন নিসা আয়াত: ২৯*
[১০৬] *সহীহ বুখারী হা: ৫৭৭৮ ও সহীহ মুসলিম হা: ১৭৫*

দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-০৬)

❖ দাওয়াতে দ্বীনের মূলনীতি:

প্রতিটি বিষয়ের জন্য মৌলিকত্ব থাকা অতি আবশ্যক একটি বিষয়। আর সকল বিষয়বস্তু নির্ভরশীল একটি মূলনীতির ওপর। সুতরাং দাওয়াতে দ্বীনের জন্যও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে যার ওপর দাওয়াত ও তাবলীগ পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। উসুল বা মূলনীতি ব্যতীত দ্বীনের দাওয়াত কোনক্রমেই সঠিক পথে পরিচালিত হবে না।

দাওয়াতে দ্বীনের মূলনীতি এমন কতগুলো বিষয়াদীর সমষ্টি যার ওপর ভিত্তি করে দ্বীনের প্রকৃত রূপ বাস্তবায়িত হবে এবং সত্য দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর সেজন্য আমরা এখানে দাওয়াতে দ্বীনের কতিপয় মূলনীতি পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

১. আদ-দা'ঈ বা দ্বীনের পথে আহ্বানকারী : দা'ওয়াতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের প্রথমটি হলো দা'ঈ। অর্থাৎ যিনি দ্বীনের দা'ওয়াতে আত্মনিয়োগ করবেন। দা'ঈ ব্যতীত দা'ওয়াতে দ্বীন পুরোপরি অচল। দা'ঈ হলেন একজন মুবাল্লিগ যিনি দ্বীনের বিষয়াদী মানুষদের কাছে পৌঁছে দেন এবং তিনি উক্ত বিষয়ের শিক্ষকও বটে।

আর আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, নাবী মুহাম্মদ ﷺ পৃথিবীতে দা'ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের প্রথম দা'ঈ বা মুবাল্লিগ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

হে নাবী ﷺ! নিশ্চয় আমরা আপনাকে সাক্ষীরূপে ও সুসংবাদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।[১০৭]

অর্থাৎ : নাবী মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত একজন দা'ঈ। যিনি মানুষদের রবের ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন। আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত,

" أن هذه الآية التي في القرآن: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} [الأحزاب: ٤٥] ، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا "

কুরআনের এ আয়াত, হে নাবী ﷺ! নিশ্চয় আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেছেন যে, হে নাবী ﷺ! আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও উম্মি লোকদের মুক্তিদাতারূপে। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম রেখেছি নির্ভরকারী যে রুঢ় ও কঠোর চিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দ দ্বারা মন্দ প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং মন্দকে উপেক্ষা করবেন। আর বক্র জাতিকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিবেন না। তা এমনভাবে হবে যে, তারা বলবে : আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই। এর ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় আবৃত অন্তরসমূহ।[১০৮]

উল্লেখিত হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে দা'ঈর অপরিহার্যতার পাশাপাশি অতি অল্প কথায় একজন দা'ঈর গুণাবলীও বর্ণনা করা হয়েছে।

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[১০৭] সূরা আহযাব আয়াত : ৪৫-৪৬
[১০৮] সহীহ বুখারী হা : ৪৮৩৬

একজন দা'ঈকে অবশ্যই নম্রভাষী, আস্থাভাজন, কল্যাণকামী, বক্রতা ও কুফুরী মতবাদের উপর সত্য দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে। দা'ওয়াত ও তাবলীগের জন্য দা'ঈ বা মুবাল্লিগ যেমন মৌলিক একটি বিষয় তেমনই হাদীসে উল্লেখিত গুণাবলীও একজন দা'ঈর জন্য আবশ্যকীয় বিষয়।

২. আল মাদ'উ (المدعو) : মাদ'উ হলো সাধারণত যাকে দ্বীনের প্রতি দা'ওয়াত দেয়া হয়। দূর-অদূর, মুসলিম অমুসলিম ও পুরুষ-মহিলা সর্বস্তরের মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

দা'ওয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে মাদ'উ, একটি আবশ্যকীয় ও মৌলিক বিষয়। কেননা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রিসালাহ তো চিরস্থায়ী। আর আল্লাহ সুবহান্নাহূ ওয়া তা'আলা নাবী ﷺ- কে সমগ্র মানব জাতির কাছে দ্বীনের দা'ঈ হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। [১০৯]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

আমরা আপনাকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।[১১০]

রাসূল ﷺ যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত রাসূল; ও দা'ঈ সেহেতু সমগ্র মানব জাতি মাদ'উ বা দ্বীনের দিকে আহূত। সুতরাং দা'ঈ ও মাদ'উ পারস্পরিক আবশ্যকীয় উপাদান ও দা'ওয়াতে দ্বীনের মৌলিক দুটো বিষয়। আমরা এ বিষয়টা নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

৩. দা'ওয়াতে দ্বীনের কর্মপন্থা ও মাধ্যম: দা'ওয়াতে দ্বীনের জন্য কর্মপন্থা মাধ্যম একটি আবশ্যকীয় বিষয়, দা'ওয়াত ও দ্বীনের সফলতা ও বিফলতা বহুলাংশে তার কর্মপন্থা মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল। সুচিন্তিত কর্মপন্থা ও উপযুক্ত মাধ্যম ছাড়া দ্বীনের প্রচার ও প্রসার কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দা'ওয়াতের কর্মপন্থা ও মাধ্যম এমন একটি বিষয় যার ওপর নির্ভর করে একজন দা'ঈ তার দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাক।[১১১]

নাবী ﷺ দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সময় ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন :

(ক) নসীহাহ বা উপদেশ: দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে নসীহাহ বা উপদেশ একটি কার্যকর ও সর্বযুগীয় পন্থা, দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা হতে পারে বলে মনে হয় না।

নবী ﷺ কখনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টার্গেট করে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতেন, যেমন: রোমের বাদশা হিরাক্বলা/হিরাক্বিলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين.

নিশ্চয় আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি; ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন, ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। [১১২]

নাবী ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর সময় তাকে লক্ষ্য করে বললেন:

" يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله

ও চাচাজান, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা! আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত মা'বুদ নেই, এটা বলুন, তাহলে আমি এটাকে মাধ্যম করে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিতে পারবো। [১১৩]

আবার কখনও কোনো গোত্রকে টার্গেট করে দ্বীনের দা'ওয়াহ দিতেন। যেমন নাবী ﷺ-এর তায়েফ সফরের সু-প্রসিদ্ধ ঘটনা। [১১৪]

যখন নাবী ﷺ এর ওপর নাযিল হলো- **وأنذر عشيرتك الأقربين** আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে

[১০৯] *সূরা আরাফ আয়াত: ১৫৮*
[১১০] *সূরা সাবা আয়াত: ২৮*
[১১১] *বিস্তারিত: আল আসাসুল ইলমিয়্যাতি লি মানহাজিদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ-পৃ: ৫৮৫*
[১১২] *সহীহ বুখারী হা: ৪৫৫৩*
[১১৩] *সহীহ বুখারী হা: ১৩৬০*
[১১৪] *সহীহ বুখারী হা: ৩২৩১*

সতর্ক করুন, তখন নবী ﷺ কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্র ও ব্যক্তি বিশেষকে টার্গেট করে বললেন:

اشتروا أنفسكم من النار.

তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। [১১৫]

এছাড়াও নাবী ﷺ হাট-বাজার ও লোকালয়ে সমবেত মানুষদের লক্ষ্য করে দ্বীনের দা'ওয়াত দিতেন এ মর্মে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে।

(খ) প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে: নাবী ﷺ কখনও প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। যেমন মুয়াজ বিন জাবাল رضي الله عنه-কে ইয়ামোনে প্রেরণ করলেন এবং বললেন:

«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله،

তুমি তাদেরকে এ মর্মে, দা'ওয়াত দাও যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। [১১৬]

(গ) চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে: নাবী ﷺ কখনও চিঠি-পত্র পাঠানোর মাধ্যমে দ্বীনের দা'ওয়াত দিতেন। যেমন: নাবী ﷺ দিহয়াতুল কালবী رضي الله عنه-এর মাধ্যমে বসরার গভর্নরের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন, যাতে এটা রোম সম্রাট হিরাক্বল কিংবা হিরাক্বিলের কাছে পৌঁছে যায়। তাতে লেখা ছিলো-

فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি: ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন । আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তবে সমস্ত প্রজাদের পাপ আপনার ওপর বর্তাবে। [১১৭]আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث بكتابه إلى كسرى، مع عبد الله بن حذافة السهمي " فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب، قال: «فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق»

নাবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ আস সাহমী رضي الله عنه-কে তার পত্রসহ কিসরায প্রেরণ করেন। নাবী ﷺ তাকে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের শাসকের কাছে দেয় এবং বাহরাইনের শাসক যেন তা কিসরার নিকট পৌঁছে দেয়। কিসরা যখন পত্রখানা পড়লো, তখন তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললো। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমার যতদূর মনে পড়ে, ইবনুল মুসাইব বলেন; নাবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে এ বলে বদ দুআ করলেন যে, আল্লাহ তুমি তাদের সম্পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করে দাও। [১১৮]

এছাড়া আরো বিভিন্ন পন্থায় নাবী ﷺ দ্বীনের দা'ওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, অর্থাৎ: সেই সময়ের যতগুলো উপযোগী ও কার্যকর পন্থা ছিলো সবগুলোই তিনি দা'ওয়াতের জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন। যেমন জুমআর খুৎবা, উন্মুক্ত আলোচনা, বিভিন্ন দিনে তা'লীম বা দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সাহাবাগণকে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করাসহ বিভিন্ন পন্থায় নাবী ﷺ দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে তথ্য ও প্রযুক্তিকে দা'ওয়াতে দ্বীনের জন্য বড় একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা যায়। যেমন: প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্টনিক মিডিয়া তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াতি কার্যক্রমকে আরো গতিময় করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

[১১৫] *সহীহ বুখারী হা: ২৭৫৩*
[১১৬] *সহীহ বুখারী হা: ৪৩৪৭*
[১১৭] *সহীহ বুখারী হা: ০৭*
[১১৮] *সহীহ বুখারী হা: ৪৪২৪*

হে নাবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও উত্তম নসীহার মাধ্যমে আহ্বান করুন, এবং উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।[১১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

কথায় ঐ ব্যক্তি থেকে কে বেশি উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে ও সৎ আমল করে।[১২০]

এ আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীনের দা'ওয়াতের জন্য কথা খরচ অতি উত্তম একটি আমল আর সে কথা যত দ্রুত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যাবে ততই দ্বীনের জন্য মঙ্গল। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্বীনের বাণীগুলো খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। সুতরাং বর্তমান প্রযুক্তিকে নেয়ামত হিসাবে গ্রহণ করাটাই অধিক বাস্তব সম্মত। নাবী ﷺ বলেছেন:

فـوالله لأن يهـدى الله بـك رجـلا خـير لـك مـن أن يكون لك حمر النعم.

আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন তবে তা তোমার জন্য রক্তিম বর্ণের উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।[১২১]

উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে রক্তিম বর্ণের বহুল আলোচিত, আকাংক্ষিত ও মহামূল্যবান উত্তম বাহন ছিলো।

সুতরাং হেদায়াতের বাণী যত দ্রুত প্রচার ও প্রসার করা যায় ততোই দ্বীনের দা'ওয়াত গতিময় হবে এবং দাঈ ও দা'ওয়াত গ্রহীতা উভয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করবে। সে ক্ষেত্রে ইন্টারনেট একটি বিরাট সহায়ক হতে পারে।

সুতরাং দা'ওয়াতে দ্বীনের কর্মপদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বীনের দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মৌলিক ভিত্তির একটি। **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

[১১৯] *সূরা নাহল আয়াত: ১২৫*
[১২০] *সূরা ফুস্সিলাত আয়াত: ৩৩*
[১২১] *সহীহ বুখারী হা: ৩০০৯*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষণ্নতা

(২০ পৃষ্ঠার পর থেকে)

এমনকি কোনো কোনো দেশে তা বৈধতার স্বীকৃতিও পেয়েছে। যেমন: জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সহ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশসমূহে আত্মহত্যা একটি প্রধান সামাজিক সমস্যা হিসাবে বিবেচিত। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ, ঐশ্বর্য, বিত্ত, বৈভব ও আরাম-আয়েশ এবং যশ-খ্যাতি যেহেতু অমুসলিমদের জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য, সেহেতু এসবের কোন ঘাটতি হলে তারা জীবনকে অর্থহীন মনে করে। সেকারণেই বিভিন্নভাবে জীবননাশের উপায় ও অবলম্বন খুঁজে ফেরে। পরিশেষে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নানা উপায়ে আত্মহত্যা করে। মুসলিম সমাজেও পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সফলতার বিষয়টি মুখ্য বিবেচ্য হওয়ায় আধুনিককালে শরীয়াহ পরিপালনে অনভ্যস্ত মুসলিমরা এ ব্যাধিতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। অথচ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনকে অতি ক্ষণস্থায়ী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।] আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾

অর্থ: আর এ দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।[১২২] (অনুবাদক)

আগামী পর্বে আমরা চিন্তা ও বিষণ্নতা হতে মুক্তির উপায়গুলো আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ। **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

লাশ কবরে রাখার সময় দু'আ

«بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

অর্থ: মহান আল্লাহর নামে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতি অনুযায়ী লাশ কবরে রাখছি।[১২৩]

[১২২] *সূরা আনকাবুত আয়াত : ৬৪*
[১২৩] *সুনান ইবনু মাজাহ হা: ১৫৫০*

আমরা রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসবো কীভাবে

আব্দুল্লাহ আরমান বিন রফিক *

(পূর্বে প্রকাশের পর থেকে)

সকল প্রকার বিদ'আত প্রত্যাখ্যান করাঃ বিদ'আত হলো একটি জঘন্যতম কাজ। বহিঃশত্রুর অস্ত্রে ইসলামের যতটা ক্ষতি হয়েছে তার চেয়েও বহুগুণ ক্ষতি হয়েছে বিদ'আতের দ্বারা। অতীতের সকল নবীর শরীয়তে বিকৃতি ঘটেছে বিদ'আতের কারণেই। এজন্য বিদ'আতের ওপর অটল থেকে রাসূল ﷺ ভালোবাসার দাবি নিরর্থক ও পরকালীন সফলতার অন্তরায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

ভাবার্থঃ বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হল সেসব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা, সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে- আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে। [১২৪]

বিদ'আতের বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর অবস্থানের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ". رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরী'আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত। [১২৫]

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " .

অর্থঃ আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। [১২৬]

عن الْعِرْبَاض بْن سَارِيَةَ، يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ " عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلاَفًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " .

ইরবাদ বিন সারিয়াহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিতঃ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নাসীহাত করেন, যাতে অন্তরসমূহ ভীত হলো এবং চোখগুলো অশ্রু বর্ষণ করলো। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যেনো আমাদের মাঝে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করলেন, অতএব, আপনি আমাদের উপদেশ দিন (একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ দিন)। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করো, শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো (নেতৃ-আদেশ), যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা বিদ'আত কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। [১২৭]

عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ

---

* *সিনিয়র শিক্ষক, ডঃ এম এ বারী সালাফিয়া মাদরাসা, টাঙ্গাইল*

[১২৪] *সূরা কাহফ আয়াত: ১০৩-১০৪*

[১২৫] *সহীহ বুখারী হা: ২৬৯৭*

[১২৬] *সহীহ মুসলিম হা: ৪৩৮৫*

[১২৭] *তিরমিযী হা: ২৬৭৬*

مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي.

সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাউজের ধারে তোমাদের আগে হাজির থাকব। যে সেখানে হাজির হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউজ থেকে পান করবে সে কখনই পিপাসিত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে হাজির হবে যাদের আমি (আমার উম্মাত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এরপরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করে দেয়া হবে। নবী (ﷺ) তখন বলবেনঃ এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয় জানেন না যে, আপনার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে কী পরিবর্তন করেছে। এ কথা শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।[১২৮]

ইমাম মালেক রহিঃ বলেছেন,

قال الإمام مالك بن أنس من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ﷺ خان الرسالة

অর্থঃ যে ব্যক্তি বিদ'আত চালু করে এবং বিদ'আতকে ভালো মনে করে সে যেন এটাই ধারণা করে যে রাসূল (ﷺ) তার রিসালাতের দায়িত্বে খেয়ানত করেছেন!

তাঁকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করাঃ মূর্তিপূজার শুরুই হয়েছিলো ভালো ব্যক্তিদের প্রতি ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘনের কারণে। রাসূল (ﷺ)-কে শারীরিকভাবে নূর বলা, তাঁকে হাজির-নাযির মানা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ ও আহমাদকে একই মনে করা, তাঁর প্রশংসায় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শিরকি গান গাওয়া, বিদআতি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, মিলাদ-কিয়াম করা, বিদআতি দরুদ পাঠ ইত্যাদি তাঁর ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন। এজন্যই রাসূল (ﷺ) মৃত্যুর আগে তাঁর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেনঃ

عن عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ". يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

আয়িশা ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ নবী (ﷺ)-এর মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো, তখন মুখ হতে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেনঃ ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। (এ বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করত তা হতে তিনি সতর্ক করেছিলেন।[১২৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، قَالَ: «جَعَلْتَ لِلَّهِ نِدًّا، مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-কে বললো, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান। তিনি বলেনঃ তুমি (আল্লাহর চাওয়ার সাথে আমার চাওয়াকে সমতূল্য বলে) আল্লাহর সাথে শরীক করলে। বলো, একমাত্র আল্লাহ যা চান (তাই সংঙ্ঘটিত হয়)।[১৩০]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ـ ﷺ ـ فَقَالَ " أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَعْرِفُهَا لَكُمْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ " .

[১২৮] *সহীহ বুখারী হা: ৭০৫০*

[১২৯] *সহীহ বুখারী হা: ৪৩৬*

[১৩০] *আদাবুল মুফরাদ হা: ৭৮৮*

হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, আহলে কিতাবের এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হলে সে বললো, তোমরা কতই না উত্তম জাতি, যদি তোমরা শিরক না করতে। তোমরা বলে থাকো, "আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ যা চান"। অতঃপর সে স্বপ্নের কথাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বর্ণনা করলো। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! শোনো, আমি তো তোমাদের এরূপ কিছু বলতে শিখাইনি। তোমরা বলবে, "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এরপর/ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা চান"।[১৩১]

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণ ও আহলে বাইতকে ভালোবাসা এবং যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শনঃ সাহাবীগণ ভুলের ঊর্ধ্বে কিংবা মা'সুম নন তবে তাঁরা সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জান্নাতের সনদপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন। যারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহচর্য পেয়েছেন ও ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরাই সাহাবী। তাঁদের সকলের ব্যাপারে মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো-

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

ভাবার্থঃ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

সুতরাং তাঁদের রাজনৈতিক ও ইজতিহাদী মতপার্থক্যকে সমালোচনার খোরাক না বানিয়ে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাদের সমালোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ও ইতিবাচক বিষয়গুলো আলোচনা করা প্রকৃত ঈমানের পরিচয় বহন করে।

সাহাবীদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ " .

আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (দান) ব্যয় করে তবে তা তাদের কোনো একজনের এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ ব্যয়ের সমানও হবে না।[১৩২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ সর্বোত্তম হল আমার যুগের লোকেরা। তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যুগের লোকেরা, তারপর উত্তম হল তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা।[১৩৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন:

فأما من سب أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بيته وغيرهم: فقد أطلق الإمام أحمد أنه يُضْرَب ضرباً نكالاً، وتَوَقَّفَ عن كفره وقتله"

অর্থঃ যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোনো সাহাবী বা আহলে বাইতের কোনো সদস্যকে গালি দেবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এজন্য তাকে হত্যা করা কিংবা কাফের বলা যাবে না।

রাসূলের প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার দৃষ্টান্তঃ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি সাহাবীদের মতো নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

ইসলামের সমালোচকরাও এই সত্যতা স্বীকার করে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসায় মুহাজিররা নিজেদের সবকিছু ফেলে শূন্য হাতে মদীনায় হিজরত করেছেন। আনসাররাও নিজেদের খাদ্য, স্থাবর সম্পদ এমনকি নিজেদের প্রিয় স্ত্রীকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের কারণে তাঁরা মুহাজিরদের হাতে সমর্পণ করেছেন। জগতে এমন উদাহরণ আর একটিও নেই।

سئل علي بن طالب - رضي الله عنه- كيف كان حبكم لرسول الله - ﷺ- فقال: (كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا، وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ).

[১৩১] *ইবনু মাজাহ হা: ২১১৮*

[১৩২] *সুনানে আবু দাউদ হা : ৪৬৫৮*

[১৩৩] *সহীহ বুখারী হা : ৬৪২৯*

إذا دخلت الجنة، خشيت ألا أراك، فلم يرد عليه النبي - ﷺ- شيئًا حتى نزل جبريل بهذه الآية: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। এমনকি আমার আদরের সন্তানের চেয়েও আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি। বাড়িতে থাকা অবস্থায় যখনই আপনার কথা মনে পড়ে আপনাকে এসে না দেখা পর্যন্ত সবর করতে পারি না। আর যখন আমার নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় তখন ভাবি আপনিতো নবীদের সাথে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করবেন। এজন্য আশংঙ্কা করি আমি জান্নাতে অবস্থান করলেও আপনার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হবো। তাঁর এই ভালোবাসা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো জবাব দিলেন না। স্বয়ং জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সেই সাহাবীর জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন, "যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নি'মাত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী"!

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মহিলা সাহাবিদের ভালোবাসার দৃষ্টান্তঃ

أخرج ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله - ﷺ- بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها، وأخوها، وأبوها مع رسول الله - ﷺ - بأُحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله - ﷺ قالوا: خيرًا يا أمّ فلان، هو بحمد الله كما تحبين، قالت: أَرونيه؛ حتى أنظر إليه. قال: فأُشير لها إليه، حتى إذا رأته قالت: كل مُصيبة بعدك جَلل

উহুদ যুদ্ধে বনি দীনার গোত্রের এক মহিলার স্বামী, ভাই ও বাবা নিহত হয়। যখন তাকে এই সংবাদ দেওয়া হলো তিনি (এই দুঃসংবাদের দিকে নূন্যতম ভ্রুক্ষেপ না করেই) বললেন, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী অবস্থা, তিনি সুস্থ আছেন তো? সাহাবীগণ বললেন, প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সুস্থই আছেন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি আপনাদের ভালোবাসা কেমন ছিলো?

জবাবে তিনি বললেন, "আমাদের সম্পদ, সন্তান, পিতা-মাতার চেয়েও তিনি আমাদের কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। এমনকি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট ঠাণ্ডা পানি যতটা প্রিয় তিনি আমাদের কাছে তার চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন!"

জায়েদ ইবনু দাছিনা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -কে কুরাইশদের হাতে বন্দী অবস্থায় আবু সফিয়ান তাঁকে প্রস্তাব করলো..

أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرِب عُنقه، وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأني جالس في أهلي، قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا، كحب أصحاب محمد محمدًا

হে যায়েদ, তুমি কি পছন্দ করো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখন তোমার স্থলে বন্দী অবস্থায় থাকুক এবং আমরা তার মস্তক ছিন্ন করি আর তুমি নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাও? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার তরবারির নিচে অবস্থান করা দূরে থাক তিনি এখন বর্তমানে যেখানে (নিরাপদে) আছেন সেখানে অবস্থান করেও তাঁর শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক তা আমি চাই না।

তখন আবু সুফিয়ান তাঁর বিস্ময়কর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখে বলেছিলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর সাহাবীরা যতটা ভালোবাসে কোনো মানুষকেই কখনো অপর কোনো মানুষকে এতোটা ভালোবাসতে দেখিনি!

عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: "يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك، عرَفت أنك إذا دخلت الجنة رُفِعت مع النبيين، وأني

যেমনটি আপনি কামনা করেন। তিনি বললেন, রাসূল ﷺ কোথায় আমাকে দেখাও। সাহাবীগণ ইশারা দিয়ে রাসূলকে ﷺ দেখালেন। প্রিয় রাসূলকে তখন দেখে তিনি বললেন, "(আপনি সুস্থ আছেন) তাই সকল বিপদই এখন আমার কাছে তুচ্ছ!" (এই আছারটি মুরসাল সনদে বর্ণিত)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ " . قَالَتْ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ .

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের গৃহে আসলেন এবং আরাম করলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলেন, আর আমার মা একটি ছোট বোতল নিয়ে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী ﷺ জাগ্রত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে উম্মু সুলায়ম! একী করছ? আমার মা বললেন, এ হচ্ছে আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মেশাই, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।[১৩৪]

রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসার বিনিময় ও মর্যাদাঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ " وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ " . قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " . قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " . قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ .

আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলো, অতঃপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিয়ামাত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, তুমি সেদিনের জন্যে কী পাথেয় সংগ্রহ করেছ? সে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বাত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার সাথে থাকবে যাকে তুমি মুহাব্বাত কর। আনাস ﷺ বলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, আবূ বকর ﷺ ও উমার ﷺ-কে পছন্দ করি। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, কিয়ামাতের দিনে আমি তাদের সাথে থাকব, যদিও আমি তাঁদের সমান আমাল করতে পারিনি।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন আমরা তাঁর সুন্নাহ ও শরীয়াহ আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে ব্রতী হবো। তাঁর উম্মত হিসেবে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় নিষ্ঠার সাথে তা পালন করাই হলো প্রকৃত ভালোবাসা। এমনকি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনেরও একমাত্র পথ হলো তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ।[১৩৫]

মুহাম্মদ ﷺ হলেন মহান চরিত্রের অধিকারী ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্য যুগোপযোগী ও সার্বজনীন উত্তম আদর্শ এবং কল্যাণ তিনি নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন। তাঁর বাণীর সার্বজনীনতার আওতায় মানুষ তো বটেই এমনকি জীব -জন্তু, কীট-পতঙ্গসহ সমস্ত সৃষ্টিজগত কল্যাণ ও শান্তির আশ্বাস পায়। এজন্যই তিনি রহমাতুলল্লিল আ'লামীন। তিনি আমাদের প্রাণের স্পন্দন ও আমাদের জন্য সর্বশেষ আসমানী বার্তাবাহক। দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনেই তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর জীবনের প্রতিটি জীবনকর্মই সমালোচনার ঊর্ধ্বে ও ত্রুটিমুক্ত। তাঁর প্রশংসায় যত কিছুই লেখা হোক তা যথেষ্ট নয়। তাই কবি আহমাদ শাওক্বী রাসূলের প্রশংসায় ﷺ বলেছেনঃ

أَخوكَ عيسى دَعا مَيتاً فَقامَ لَهُ وَأَنتَ أَحيَيتَ أَجيالاً مِنَ الرَمَمِ.

আপনার ভাই ঈসা ﷺ-এর ডাকে একজন মুর্দা উঠেছিলো জেগে, কিন্তু সমগ্র উম্মাহ জাগ্রত হয়েছে কেবল আপনারই ডাকে। ❑❑

[১৩৪] *সহীহ মুসলিম হা: ৫৯৪৯*

[১৩৫] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত: ৩১*

বজ্র ও বিজলী

সাইদুর রহমান*

অনেক দিন ধরে মনে মনে ভাবছি বজ্র ও বিজলী নিয়ে কিছু লিখবো। কারণ বর্তমানে বজ্র ও বিজলীর আঘাতে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। তাই বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মাঝে অন্যতম দু'টি সৃষ্টি হচ্ছে বজ্র ও বিজলী। পৃথিবীতে সমস্ত জিনিস যেভাবে আল্লাহর গুণকীর্তন করে, ঠিক সেভাবে বজ্র ও বিজলীও আল্লাহর গুণকীর্তন করে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾

অর্থঃ বর্জ তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতাগণও তাই করে।[১৩৬] কিভাবে তাসবীহ পাঠ করে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আল্লাহ বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

অর্থঃ সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা বুঝতে পারনা।[১৩৭]

বজ্র ও বিজলী পরিচিতিঃ বজ্র ও বিজলী নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তারা এখন পর্যন্ত এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। কিন্তু আমরা এর সঠিক সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ হাদীস থেকে পেয়েছি।

বজ্র ও বিজলী আসলে কী? রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে বলেন,

عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا ياأبا القاسم أخبرنا عن ما هو؟ قال ملك من الملاءكة مؤكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله فقالوا فما هذا الصوت الذى نسمع؟ قال زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهى حيث أمر قالوا صدقت.

অর্থঃ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আমাদেরকে বজ্র (মেঘের গর্জন) প্রসঙ্গে বলুন; এটা আসলে কী? তিনি বলেন, মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছেন। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে তিনি মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যেদিকে আল্লাহ চান। তারা বলল, আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তার তাৎপর্য কী? রাসূল ﷺ বললেন, এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাঁকডাক। এভাবে হাঁকডাক দিয়ে তিনি মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যান।[১৩৮]

এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বজ্র হলো ফেরেশতার হাঁকডাক আর বিজলী হলো ফেরেশতা যে চাবুক দিয়ে মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় ঐ চাবুকের ঝলক বা আঘাত।

قال ابن عباس إن الرعد ملک ينعق بالغيث كما ينعق الداعى بغنمه.

অর্থঃ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হলেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যেমন রাখাল তার মেষপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।[১৩৯]

বিজলী ও বজ্রপাত কেন হয়ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বজ্রপাত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন,

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ.

অর্থঃ তিনিই তোমারদেরকে বিজলী দেখান ভয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষারূপে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ।[১৪০]

---

* শিক্ষক: জামিয়া সালাফিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

[১৩৬] সূরা রা'দ আয়াত: ১৩

[১৩৭] সূরা বানী ইসরাঈল আয়াত: ৪৪

[১৩৮] তিরমিযী হা: ৩১১৭ সহীহ

[১৩৯] আদাবুল মুফরাদ হা: ৭২৭ হাসান

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিজলী প্রেরণের দু'টি কারণ বর্ণনা করেন।

(১) ভয় দেখানোর জন্য। পৃথিবীতে যারা স্বৈরাচারী আল্লাহর বিধি-বিধানকে লঙ্ঘন করে, মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার, নির্যাতন অন্যায় অবিচার ও অনাচার করে বেড়ায় তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা এই বিজলী প্রেরণ করেন। তিনি একথা বুঝাতে চান যে, হে পৃথিবীর অত্যাচারীরা! তোমরা সাবধান হও! অন্যাথায় তোমাদের ওপর শাস্তি অবধারিত। ইমাম কাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহি) বলেন, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা বিজলীর মুসাফিরকে ভয় দেখান এবং বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে বৃষ্টি হওয়ার আশা দেখান।[১৪১]

(২) আশা-আকাঙ্ক্ষারূপে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকার মানুষরা বৃষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আল্লাহ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে বিজলী প্রেরণের কারণ বর্ণনা করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا.

অর্থঃ আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তোমাদেরকে প্রদর্শন করান বিজলী ভয় ও আশারূপে।[১৪২] এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, বিজলী প্রেরণের অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষদেরকে আল্লাহর নিদর্শন দেখানো। অর্থাৎ এত শক্তিশালী পাওয়ারফুল বিদ্যুৎ বা বিজলী দেখে মানুষরা যেন আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসে।

কখন বজ্রপাত বেশি হবেঃ বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, বজ্রপাত সবচেয়ে বেশি পতিত হবে শেষ যুগে। অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে। যেমনঃ এক হাদীসে এসেছে,

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى ياتى الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان.

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হবে। এমনকি এক ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলবে, আগামীকাল তোমাদের মাঝে কার উপর বজ্রপাত হবে? তখন তারা বলবে, উমুক, উমুক ও অমুকের ওপর।[১৪৩]

কাদের ওপর বজ্রপাত হবেঃ পৃথিবীতে যারা পাপিষ্ঠ তাদের উপর বজ্রপাত হবে। এক হাদীসে এসেছে,

عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال " : اذهب فادعه لي " . قال : فذهب إليه فقال : يدعوك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال له : من رسول الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو ؟ أم من فضة هو ؟ أم من نحاس هو ؟ قال : فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – فأخبره ، فقال : يا رسول الله ، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك ، قال لي كذا وكذا . فقال : " ارجع إليه الثانية " . أراه ، فذهب فقال له مثلها . فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك . قال : " ارجع إليه فادعه " . فرجع إليه الثالثة . قال : فأعاد عليه ذلك الكلام . فبينا هو يكلمه ، إذ بعث الله ، عز وجل ، سحابة حيال رأسه ، فرعدت ، فوقعت منها صاعقة ، فذهب بقحف رأسه.

অর্থঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে আরবের কোনো এক অহঙ্কারী লোকের কাছে প্রেরণ করেন। সে বলল, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে ডেকেছে। ঐ ব্যক্তি তাকে বলল, আল্লাহ ও রাসূল আবার কে? স্বর্ণের, নাকি রূপার? নাকি তামার? তারপর সে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, সে ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করে এই এই বলেছে। তখন তিনি তাকে বলেছেন, দ্বিতীয়বার যাও, আমি তাকে দেখবো। **(বাকী অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

[১৪০] *সূরা রা'দ আয়াত: ১২*
[১৪১] *ইবনে কাসীর*
[১৪২] *সূরা রূম আয়াত: ২৪*
[১৪৩] *ইবনু কাসীর*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

ইসলামী অর্থনীতির প্রথম পাঠ

তাওহীদুল ইসলাম*

(পর্ব-১)

অর্থ মানব জীবন দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। জীবন পরিচালনার সিংহভাগ কাজ নির্ভর করে অর্থের ওপর। প্রত্যেকে সামজিকভাবে অথবা অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে অর্থের সুন্দর ও সুষম ব্যবস্থাপনা নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়। তাই সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা অর্থনীতি। অন্যদিকে ইসলাম হল আল্লাহর দেওয়া সার্বজনীন ধর্ম; এখানে তিনি সকল বিষয়ের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা আলোচনা করেছেন। অর্থনীতির বর্ণনাও কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত পাওয়া যায়। প্রতিটি হাদীস গ্রন্থে বুয়ূ' (ক্রয়-বিক্রয়/ অর্থনৈতিক লেনদেন) নিয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব অন্য সকল বিষযের মতই ইসলামে অর্থনীতি নিয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে সাধারণ অর্থনীতি বা ইসলামী অর্থনীতি কঠিন শাস্ত্রগুলোর একটি যা সহজে পঠন, অনুধাবন ও স্থাপন করা যায় না। এ জন্যই বোদ্ধামহল ব্যতীত অর্থনীতির আলাপ ততটা পরিলক্ষিত হয় না। তাই পাঠকের নিকট এমন ভাবলেশহীন গুরুগম্ভীর বিষয়কে সুখপাঠে পরিণত করতে আমাদের ধারাবাহিক লিখনি হল ইসলামী অর্থনীতির প্রথম পাঠ। লিখনিটি একটি সংকলনধর্মী লেখা। এখানে প্রতিটি পর্বে ইসলামের আলোকে অর্থনীতির সব দিকের আলোচনা করা হবে সাবলীল ও সহজ ভাষায়।

১. অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির পরিচয়:

১. ১. অর্থনীতির পরিচয়,

অর্থনীতির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। অর্থনীতি যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানের একটি বিষয়, তাই সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বিজ্ঞানীগণ অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের মতে: "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"[১৪৪]

জন স্টুয়ার্ট মিলের(১৮০৬-১৮৭৩) মতে, অর্থনীতি হল সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবহারিক বিজ্ঞান।[১৪৫]

মূলত: অর্থ সংগ্রহ, অর্জন, আহরণ, বৃদ্ধি, বন্টন, ভোগ, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা, শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা এবং এ সবের নিয়মনীতির শাস্ত্রকেই অর্থ শাস্ত্র, অর্থ বিদ্যা, অর্থবিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব বা অর্থনীতি (economics) বলা হয়।[১৪৬]

১.২. ইসলামী অর্থনীতির পরিচয়,

ইসলাম অর্থনীতির অস্বাভাবিক কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেনা।

মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে, ''ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জনসাধারণের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।"[১৪৭]

পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ আকরাম খান তার বিখ্যাত গ্রন্থ'An Introduction to Islamic Economics' এ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, ''সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিতকরণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই ইসলামী অর্থনীতি।"[১৪৮]

অতএব ইসলাম বলে, সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ, মানুষ সম্পদের আমানতদার এবং অর্থ মানব জীবনের অখণ্ড ও অবিভাজ্য বিষয়সমূহের একটি মাত্র। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে: "আল্লাহ নির্দেশিত জীবন দর্শনের ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা আহরণ, আহরিত সম্পদের ন্যায্য বন্টন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যয় ও ভোগ

* দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয় আরাবীয়, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

144 An Enquiry into the Nature and Causes of wealth of nations
145 Principles of political Economy of Taxation
146 ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা, ২০০৯, পৃ, ৬
147 Ibn khaldun. ''The Muqaddimah'': An Introduction to History, Translated from Arabic by Franz Rozenthal, New York,Pantheon, 1958, p 23.
১৪৮ An Introduction to Islamic Economics, 1994, P 33-45

ব্যবহারের নির্দেশনাই অর্থনীতি।" আমাদের মতে, এটাই অর্থনীতির সঠিক সংজ্ঞা হওয়া উচিত।[১৪৯]

ইসলামী অর্থনীতির ব্যবহারিক দিক অর্থনীতির অন্য প্রকারগুলো অপেক্ষা অধিক মানব কল্যাণমুখী যা সামনের আলোচনায় ফুটে উঠবে।

২. ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার মতই অর্থব্যবস্থাও তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো:

২.১. দর্শনগত ভিত্তির ওপর পরিচালিত হওয়া:

দর্শনগত ভিত্তি বলতে বুঝায় বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণা। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দর্শনগত ভিত্তি তিনটি। সেগুলো হলো:

ক. তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একাকত্ব এবং এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য)।

খ. খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি)।

গ. আদল (ন্যায়, নায্য ও সুষমনীতি; Justice)। এই তিনটি মূলনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩. মাকাসিদে শরীয়া (শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ) অর্জনের জন্যে তৎপর থাকা:
মাকাসিদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন মাকসাদ। মাকসাদ মানে- উদ্দেশ্য (objective)। ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তাআলা যে নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই একমাত্র মানব কল্যাণের শরীয়া। মানুষের ইহজাগতিক এবং পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ শরীয়া প্রদান করেছেন। ইসলামি শরীয়ার মূল উৎস (source) হলো আল-কুরআন ও সুন্নতে রসূল ﷺ। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মাকাসিদে শরিয়া বা ইসলামি শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:
ক. ঈমান ও তাওহীদ: অর্থাৎ মুমিনদের ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ।

[১৪৯] *প্রাগুক্ত*

খ. আদল: ন্যায় বিচার ও সুষমনীতি নিশ্চিতকরণ।
গ.. ইহসান ও ফালাহে 'আম: মানবতার কল্যাণ ও সাফল্য।
ঘ. হায়াতে তাইয়্যেবা: সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন।
ঙ. মানবতার কল্যাণ, সাফল্য এবং সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।
চ. জীবনের নিরাপত্তা।
ছ. মানব বংশ সংরক্ষণ।
জ. সম্পদের নিরাপত্তা।
ঝ. মর্যাদা তথা মান সম্মান ও ইয্যতের নিরাপত্তা।
ঞ. মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ও বিকাশের সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
ট. চিন্তা, চলাফেরা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।
ঠ. সামগ্রিক মানবাধিকার সংরক্ষণ।

২.৩. হিকমা বা কর্মকৌশল ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ:

শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্যে হিকমা প্রয়োগ অপরিহার্য। হিকমা মানে- যথার্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো। মূলত টিকে থাকা, উন্নয়ন, সাফল্য অর্জনের কৌশল ও সঠিক পদক্ষেপকে হিকমা বলা হয়। কুরআন বলছে, রসূল সা. তাঁর সাথীদের মানবিক ও নৈতিক সত্তার উন্নয়ন এবং কিতাব শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে হিকমাও শিক্ষা দিতেন:

﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়ে, যিনি তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের তাযকিয়া (মানবিক ও নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন) করেন, তাদের আল কিতাব (কুরআন) এবং হিকমা শিক্ষা দান করেন।[১৫০]

[১৫০] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত: ১৬৪*

মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সমাজের গোটা অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ভিত্তি হলো এই তিনটি। সুতরাং ইসলামি অর্থনীতির মূল ভিত্তিও এই তিনটি।[১৫১]

৩. ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ইসলামী অর্থনীতির অসংখ্য মূলনীতি ও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বান্দাকে অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থের প্রকৃত মালিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মানব কল্যাণের দিকটিকেও সামনে তুলে ধরে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

৩.১. অর্থ সম্পদের মূল মালিক ও যোগানদাতা মহান আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ বলেন,

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর ভাণ্ডারের চাবিকাঠির মালিকানা ও কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার জীবিকায় (অর্থ সম্পদে) প্রশস্ততা দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা সীমিত দিয়ে থাকেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।[১৫২]

১.৪ মানুষ সম্পদের মূল মালিক নয়, আমানতদার এবং ব্যবহারকারী বা ভোক্তা মাত্র। সুতরাং সে সম্পদের উৎপাদন, উপার্জন এবং ভোগ ব্যবহার করবে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মাফিক। আল্লাহর বাণী:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

আল্লাহ সেই মহানুভব সত্ত্বা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।[১৫৩]

আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

আমরা পৃথিবীতে তোমাদের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সেখানেই রেখে দিয়েছি তোমাদের জীবনের উপকরণ।[১৫৪]

১.৫. মানুষের আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি তার বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে একীভূত ও অবিভাজ্য। সুতরাং তার আর্থ-সামাজিক বিষয়াদির উন্নয়ন ও ইতিবাচক নির্দেশনার ভিত্তি হবে তার বিশ্বাস, আদর্শ এবং শরীয়া তথা কুরআন, সুন্নাহর আলোকে।

তাই আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থ: তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন।[১৫৫]

১.৬. ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হলো, জাতি ধর্ম, ভাষা বর্ণ এবং কুল গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধন বা মানবকল্যাণ।

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

এবং তাদের (বিত্তবানদের) অর্থ সম্পদে অধিকার রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।[১৫৬]

১.৭. ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আদল তথা ইনসাফ, সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণতা (Justice and balance) । আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ করা। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১৫৭]

---

[১৫১] *প্রাগুক্ত*
[১৫২] *সূরা শূরা আয়াত: ১২*
[১৫৩] *সূরা বাকারা আয়াত: ২৯*
[১৫৪] *সূরা আ'রাফ আয়াত: ১০*
[১৫৫] *সূরা আন'আম আয়াত: ১৬৫*
[১৫৬] *সূরা যারিয়াত আয়াত: ১৯*
[১৫৭] *সূরা বাকারা আয়াত:১৬৮*

১.৮. ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংঘাত নয়, বরং পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতা (ইহ্সান)। আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, আল্লাহর পথে খরচ না করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। মানুষের প্রতি ইহসান করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদের (কল্যাণকারীদের) ভালোবাসেন।[১৫৮]

৩.৭. ইসলামি অর্থ-ব্যবস্থায় যুল্ম ও নিবর্তনমূলক সকল পন্থা ও প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ।

﴿وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।[১৫৯]

৩.৮. ইসলামি অর্থব্যবস্থা উৎপাদন, উপার্জন ও উন্নয়নমুখী।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

তুমি জিজ্ঞেস করঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও - এই সমস্ত তো তাদের জন্যই যারা পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাস করে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি।[১৬০]

৩.৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থ সম্পদের কৃপণতা, অলস পুঞ্জীভূতকরণ এবং অনুৎপাদনশীল সঞ্চয় নিষিদ্ধ।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾

তুমি (কার্পণ্য করে) নিজের হাতকে গলায় বেঁধে রেখো না, আবার (উজাড় করে খরচ করে ফেলার জন্যে) তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করেও দিও না। এমনটি করলে তিরস্কৃত হবে এবং খালি হাতে বসে পড়বে।[১৬১]

৩.১০. ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের অপব্যবহার, অপব্যয় এবং অপচয় নিষিদ্ধ।

﴿يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর, আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না।[১৬২]

৩.১১. ইসলামি অর্থনীতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

৩.১২. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকারের স্বীকৃতি।

﴿اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

সাদাক্বাহ হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই

[১৫৮] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৯৫*
[১৫৯] *সূরা ফুরকান আয়াত: ৬৭*
[১৬০] *সূরা আল-আরাফ আয়াত: ৩২*
[১৬১] *সূরা ইসরা আয়াত: ২৯*
[১৬২] *সূরা আল আরাফ আয়াত: ৩১*

হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।[১৬৩]

৩.১৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নির্দেশনা সম্বলিত সার্বজনীন জনহিতৈষী ব্যবস্থা।

৩.১৪. অর্থ হবে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে মানুষ ও মানবতার মুক্তির হাতিয়ার।

৩.১৫. ব্যক্তি মালিকানার অধিকার। পুরুষ নারী প্রত্যেকেই বৈধ পন্থায় অর্জিত নিজ সম্পদের স্বত্বাধিকারী সে নিজে। বৈধ পন্থায় স্বাধীনভাবে এর বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও ব্যয় ব্যহারের অধিকার তার জন্যে সংরক্ষিত। আল্লাহ সে দিকেই ইঙ্গিত করে বলেন,

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا﴾

আল্লাহ যেসব জিনিস দিয়ে তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেটার জন্যে তোমরা লালসা করো না। পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্‌র কাছে তার অনুগ্রহ (অর্থ সম্প, সহায় সম্বল) প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।[১৬৪]

৩.১৬. যাকাত: অভাবী ও বিপদগ্রস্তদের অধিকার হিসেবে ধনীদের নগদ ও বিনিয়োগকৃত অর্থ, ফল ফসল এবং গবাদি পশুসহ সর্বপ্রকার বর্ধনশীল সম্পদের যাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

৩.১৭. সুদ ও সুদী কারবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

﴿اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইত্বানের স্পর্শে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামাত দিবসে দণ্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়; অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে সে নিবৃত্ত হয়; সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহর ওপর নির্ভর; এবং যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে।[১৬৫]

৩.১৮. উত্তরাধিকার বিধান: শরীয়া নির্ধারীত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টন বাধ্যতামূলক।

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا﴾

পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ।[১৬৬]

৩.১৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, মাকাসিদে শরীয়া বা ইসলামি শরীয়ার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন।

৩.২০. ইসলামি অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, বিশ্বাসী হিসেবে দুনিয়ায় সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের মাধ্যমে আখিরাতের সাফল্য অর্জন।[১৬৭]

ইসলামী অর্থনীতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতিসমূহ থেকে প্রমাণিত দুনিয়াবী জীবনকে স্বচ্ছলতায় কাটিয়ে আখেরাতী সফলতা পেতে অর্থ যেমন জরুরি তেমনি অর্থ ব্যবস্থাপনার নীতি জানা আবশ্যক। **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

---

[১৬৩] *সূরা আত-তাওবা আয়াত: ৬০*
[১৬৪] *সূরা নিসা আয়াত: ৩২*
[১৬৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ২৭৫*
[১৬৬] *সূরা আন-নিসা আয়াত: ৭*
[১৬৭] *প্রাগুক্ত*

বিদায় হিজরী (১৪৪৩)

মূল: শাইখ সালিহ বিন ফাওযান বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)

ভাষান্তর: **সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব**★

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার যিনি রাত আর দিনকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। সমস্ত গুণকীর্তন একমাত্র তাঁর তরেই নিহিত যিনি সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় আর চাঁদকে করেছেন আলোকময়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই।

তিনি জালেমদের বিরূপ মন্তব্য থেকে বহু উর্দ্ধে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ!

তাক্বওয়া অবলম্বন করুন। যা দেখছেন আর যা শুনছেন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, বছর শেষে নতুন বছরের আগমন ঘটছে, অথচ আমরা এখনও অবসাদ আর উদাসীনতায় ডুবে রয়েছি।

মানুষ কত বছর বেঁচে থাকে? আশি, নব্বই...। ধরে নিলাম কেউ দুশো বছরের জীবন লাভ করলো। এই সময়টা কি খুব বেশি? না! এটা নিতান্তই অল্প সময়। বলা হয়ে থাকে যে, নূহ (আলাইহিস সালাম), যিনি নিজ জাতির মাঝে ৯৫০ বছর বর্তমান ছিলেন। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই দুনিয়ার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন: 'এই দুনিয়া যেন এক দরজা দিয়ে প্রবেশ আর অন্য দরজা দিয়ে বের হওয়ার মতো।

সুতরাং, তাক্বওয়া অবলম্বন করুন! খুব মনোযোগের সাথে দিন আর রাতগুলোকে পর্যবেক্ষণ করুন ; কেননা এই দিন-রাত হল আপনার যাত্রাপথের এক-একটি মঞ্জিল যা আপনাকে ধীরে ধীরে আখিরাতের দিকে নিয়ে চলেছে।

সহকারী উসতায, মাদরাসাতুন নুর, বারিধারা, ঢাকা

এভাবেই একদিন আপনার সংক্ষিপ্ত সফরের ইতি ঘটবে। সৌভাগ্যবান তো সেই যে এই দিনগুলোকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কাজে ব্যয় করে থাকে, নিজেকে সর্বদা রবের আনুগত্যে ব্যস্ত রাখে এবং জীবনের পথচলায় অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

{আল্লাহ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।[১৬৮]

চলতি হিজরী বর্ষ আর মাত্র কয়েকদিন পরই তার নথিপত্র গুটিয়ে নেবে। যে ব্যক্তি এই সময়ের মাঝে সৎকাজ করেছে এবং সৎপথে অটল থেকেছে, তার জন্য বিষয়টি সুখকর হলেও, যে লোকটি সারা বছর পাপকাজে জড়িয়ে ছিল, তার জন্য দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই নেই। বছরটা কিভাবে অতিবাহিত করলেন, একটু ভেবে দেখুন। আমলের খাতায় কী লিখলেন, একটু খুঁটিয়ে দেখুন। যদি কল্যাণকর কিছু করেই থাকেন তবে 'আলহামদু লিল্লাহ। আর যদি অকল্যাণকর কিছু হয়ে থাকে তবে 'তাওবাহ ও ইসতিগফার।

পুরো মাসজুড়ে একজন ব্যক্তি বুকে কতশত আশা ধারণ করে রাখে, অথচ সে জানে যে, তার জীবনের মেয়াদ দিন-দিন কমছে। প্রতিটি ক্ষণ যেন তার সফরের এক একটি মঞ্জিল। প্রতিটি মুহূর্ত যেন তার খাতার একএকটি পৃষ্ঠা। প্রতিটি সেকেন্ড যেন কবরের পানে এক একটি পদক্ষেপ। সুতরাং, যে তার রবের সান্নিধ্য লাভের প্রস্তুতি নিচ্ছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তো এ কথাগুলো ভেবে আনন্দিত হতে পারে।

সূর্যকে দেখুন। সে প্রতিদিন উদিত হয়, সময় হলেই অস্তমিত হয়ে যায়। পার্থিব জীবনটাও সেরকম; উদিত হওয়ার পর একদিন অস্তমিত হয়ে যাবে। বছরগুলোকে দেখুন। একটি বছরের ক্লান্তিলগ্নে নতুন বছরের পদার্পণ।

[১৬৮] *সূরা আন-নূর আয়াত: ৪৪*

কিন্তু প্রশ্ন হল- বিগত বছরকে আপনি কী দ্বারা বিদায় জানালেন আর নতুন বছরকে কিভাবে বরণ করে নিলেন?

সুতরাং, আমাদের সকলেরই ভেবে দেখা উচিত যে, বিগত বছর আমি আমার নিজের জন্য কী রেখে এসেছি?

যদি ভালো কিছু করেই থাকি তবে এ বছর ভাল কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিব। অন্যথায় অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ করবো। কেননা, ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রাসূল ﷺ বলেন:

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا.

মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে।[১৬৯]

চলুন না, নিজের সাথে নিজেই হিসাব করতে বসে যাই; আজ পর্যন্ত কতটুকু ফরয আদায় করতে পেরেছি? হকদারের হক বুঝিয়ে দিতে পেরেছি তো? আমার কষ্টের উপার্জনের উৎস হালাল তো? তাছাড়া আমি এগুলো কিভাবে খরচ করেছি?

প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আত্মসমালোচনা করুন! আজকের আপনিই একমাত্র আপনার আগামীর সুন্দর পথচলা নিশ্চিত করতে পারেন।

আগামীকাল আপনার সামনে কী নিয়ে হাজির হবে তা জানার উপায় নেই। প্রতিটি বছর নয়, প্রতিটি দিনশেষে নিজ কর্মের হিসাব নিয়ে বসে পড়ুন। কেননা আপনার নফস একটি সুরক্ষিত সিন্দুক, যা আপনার আমলনামাকে হেফাযত করে আসছে। খুব শিগগিরই সিন্দুকটির মুখ খুলে যাবে। তখন আপনি যা জমা করেছিলেন তা দেখতে পাবেন।

বছরের সমাপ্তি আমাদেরকে বয়স ফুরিয়ে আসার শিক্ষা দেয়, সময়ের দ্রুত আবর্তন আমাদেরকে মৃত্যু ঘনিয়ে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অবস্থার পরিবর্তন আমাদেরকে দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও আখিরাতের আগমনের আভাস দেয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মাঝে কত মানুষের জন্ম হল আর কত জীবিত ব্যক্তি না ফেরার দেশে চলে গেল, কত গরীব ধন-দৌলত লাভ করলো আর কত স্বচ্ছল ব্যক্তি দরিদ্রতার মুখ দেখলো, কত তুচ্ছ ব্যক্তি সম্মানিত হল আর কত সম্মানিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত হল!

﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

﴿تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

বল, ‘হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ‘আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিযক্ব দান করেন।[১৭০]

আপনার জীবনের আর কতক্ষণ অবশিষ্ট আছে? কয়েক ঘণ্ডা, কয়েক দিন...। হয়তো আর বেশিদিন বাকি নেই। আপনার জীবনের প্রথমাংশ যদি খর্ব করে থাকেন তবে যতটুকু সুযোগ সামনে রয়েছে তা যেন বিফলে চলে না যায়। মুমিনের জীবন তো এক অমূল্য সম্পদ। রাসূল ﷺ বলেছেন:

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজকে বিরাট সম্পদ মনে করো। ১. তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, ২. রোগাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে, ৩.

[১৬৯] *সহীহ তিরমিযী হা: ১৯৮৭*

[১৭০] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ২৬-২৭*

দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে, ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে।[১৭১]

এভাবেই আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে নসীহাহ করেছেন। যৌবনকাল মাত্রই শক্তি ও সামর্থ্যের সময়। কিন্তু বার্ধক্য আসার সাথে সাথে মানুষ দুর্বল ও নিস্তেজ হতে শুরু করে। সুস্থতা মানুষকে প্রাণবন্ত আর প্রফুল রাখে। কিন্তু যখন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার জীবন থেকে প্রফুল্লতা হারিয়ে যায়, মনের মাঝে সংকীর্ণতা বিরাজ করে আর যেকোন কাজ তার পক্ষে ভারী হয়ে যায়। 'স্বচ্ছলতা'র মাঝে রয়েছে আর্থিক প্রশান্তি ও অবসর। কিন্তু দরিদ্র্যতার আঘাতে মানুষ রুটি-রুজি জোগাড় করতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'জীবন হল সৎ কাজ করার এক প্রশস্ত ময়দান।

তবে মৃত্যু এসে গেলে আমলের সুযোগ আর থাকে না। তবে তিনটি আমলের দরজা মৃত্যুর পরও উন্মুক্ত থাকবে: ১. সাদাকা জারিয়াহ, ২. উপকারী জ্ঞান এবং ৩. সৎ সন্তান।

অতএব, তাকওয়া অবলম্বন করুন। যা ছুটে গিয়েছে তাওবার মাধ্যমে তার ঘাটতি পূরণ করুন।

সৎ কাজ দিয়ে জীবনের বাকি অংশটুকুকে স্বাগত জানান। কারণ, এই দুনিয়ায় আপনার স্থায়ীত্ব সুনির্ধারিত, আপনার দিনক্ষণ হাতে গোনা কয়েকদিন মাত্র আর আপনার কৃতকর্ম মূলত লক্ষণীয়। ▣▣

বজ্র ও বিজলী

(৩১ পৃষ্ঠার পর থেকে)

অতঃপর সে গেল এবং ঐ ব্যক্তি তাকে একই কথা বলল। সে ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, সে ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করেছে। তারপর তিনি বলেন, তাকে আসতে বলো। সে তৃতীয়বার তার কাছে গিয়ে বলল, আর ঐ ব্যক্তি ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করলো।

এভাবেই সে কথা বলতেছিল; এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তার মাথার সামনে একখণ্ড মেঘমালা প্রেরণ করেন। আর সেখান থেকে একটি বজ্র পড়ে তার মাথার খুলি উড়ে গেল।[১৭২]

প্রিয় পাঠক! এই হাদীস আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, বজ্রপাত হবে ঐ সকল লোকদের ওপর, যারা পাপিষ্ট, অহঙ্কারী-দাম্ভীক ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলদ্রোহী।

অতএব, হে পাপিষ্টের দল। সাবধান হও! অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

বজ্রপাতের সময় করণীয়ঃ বজ্রপাতের সময় রাসূল ﷺ কোনো দু'আ পড়তেন কিনা এ ব্যাপারে তাঁর থেকে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায় না; কিন্তু কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বজ্রপাতের সময় একটি দু'আ পড়তেন। যেমনঃ আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু তারা নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন।

سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملاءكة من خيفته

অর্থঃ মহাপবিত্র সেই সত্ত্বা, বজ্রধ্বনি যার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতাকুল যার ভয়ে শঙ্কিত।[১৭৩]

ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, ইবনে যাকারীয়া (র) বলতেন, যে ব্যক্তি বজ্রপাতের সময় এ দু'আ পড়বে তার উপর কখনো বজ্রপাত হবে না।[১৭৪] পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই ভয়ংকর শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেন। (আমীন)▣▣

[১৭১] *তিরমিযী মুরসাল হিসেবে একে বর্ণনা করেছেন সহীহ: সহীহুল জামি ১০৭৭, তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৩৫৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ: ৩৪৩১৯, শুআবুল ঈমান ১০২৪৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮৪৬।*

[১৭২] *তাফসীর ইবনে কাসীর সূরা রা'দ*

[১৭৩] *আদাবুল মুফরাদ ৭২৮ সহীহ*

[১৭৪] *ইবনু কাসীর সূরা রা'দ*

ইমামের মর্যাদা

মূল: ড. সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী*
ভাষান্তর: শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান*

(শেষ পর্ব)

নবম বিষয়: দাওয়াতের মহৎ মাধ্যম খুতবার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা: হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমাদেরকে জুমার খুতবায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জুমার খুতবা হল এমন একটি চিঠি যা মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অনেকেই আকাঙ্ক্ষী হয়ে ইবাদাত করতে আসবে, আপনার কথা শুনতে আসবে। সুতরাং আপনি তাদের সময়কে নষ্ট করবেন না। ইমামের জন্য শোভা পায় না যে, সে তার খুতবাকে সংবাদপত্রে প্রকাশ করবে। আরো শোভা পায় না যে, সে পত্রিকা থেকে তার বিষয়কে একত্রিত করে লোকেদের সামনে উপস্থাপন করবে। তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই মাথায় যা আছে তা নিয়ে মিম্বারে উঠে যাওয়াও শোভা পায় না। বরং তিনি খুতবার বিষয়বস্তু ভালোভাবে প্রস্তুত করবেন, তবে লিখিত আকারে হওয়া আবশ্যক না। আমি সামগ্রিক দিক থেকে বলছি, খতীবই তার খুতবাকে প্রস্তুত করবেন, কিন্তু কখনো কখনো খতীবের জন্য অন্য কেউ খুতবা প্রস্তুত করেন, সে অনুযায়ী খুতবা দিতেও কোনো বাধা-বিপত্তি নেই।

ইমামকে ভাষা শৈলীর দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় না হয়। নাহু শাস্ত্র, বালাগাত শাস্ত্রের তোয়াক্কা না করে ভেঙে ভেঙে কথা বলা উচিত না [অন্যান্য ভাষার স্ব-স্ব ব্যাকরণ প্রযোজ্য]। কেননা বালাগাত শাস্ত্র অন্তরকে মোহগ্রস্ত করে। তাই কথার কলেবর না বাড়িয়ে অলঙ্কারপূর্ণ কথা ও ভাষার প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত। খুতবা খাটো হলে বিষয়বস্তু বুঝতে লোকেদের সুবিধা হয়। খুতবার সময় বিবেচনায় সালাতকে দীর্ঘ করা উচিত।

আমরা যদি আমাদের পূর্ববর্তী রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও নিকটবর্তী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রমুখের খুতবার দিকে নজর দেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো, তারা সকলেই সর্বদা জুমার খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন। যাতে মানুষ হৃদয়াঙ্গম করতে, বুঝতে ও আমল করতে সক্ষম হয়।

কখনো খতীব খুতবাকে এমনভাবে সাজান যার একটি অংশ অপর অংশকে শ্রোতাদেরকে ভুলিয়ে দেয়। এটা খুতবার ক্ষেত্রে নিন্দনীয়।

দশম বিষয়: শরীয়তকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ: মানুষের প্রয়োজনীয় শারঈ ও সামগ্রিক মূলনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্দেশ। বর্তমান যুগে মানুষের আক্বীদা ও তাওহীদ ধারণ করা বেশি প্রয়োজন। বিশুদ্ধ ধার্মিকতা অকল্যাণ বয়ে আনে না বরং কল্যাণই বয়ে আনে। সংঘটিত বিকৃতি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না। বরং সেগুলো এমন লোকের কাজ যারা নিজেদেরকে দ্বীনের দিকে সম্পৃক্ত করে।

খতীবদের কাজ হল অসৎ কাজ ব্যতীত শাসকের আনুগত্য করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা বর্তমানে সমগ্র উম্মত এটার খুবই প্রয়োজন বোধ করে। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও ধার্মিকতা অর্জনে তাদের মহান দায়িত্বকে সুদৃঢ় করা। এটাই আমাদের দ্বীনের অন্যতম মূলনীতি।

মানুষকে এ মর্মে সুদৃঢ় করা যে, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। মানুষকে ফিতনা থেকে সতর্ক করা। কারণ আমরা মুসলিম ভূখণ্ডে বহু ফিতনা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং খতীব ও ইমামকে আল্লাহর বাণী, রাসূলের ﷺ-এর বাণী ও সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুপাতে কৌশলী জ্ঞান দ্বারা এই ফিতনা থেকে সতর্ক করতে হবে।

হে ভাই! এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এটাই মূলত মুসলিমদের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা।

সম্মানিত সুধী! যে মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা, কল্যাণ ও সাহায্য করতে চায় তাকে রাসূল ﷺ ও তার সাহাবাদের যুগে ফিরে যেতে হবে। কেননা সেটাই মর্যাদার সময় ছিল। আজ অধিকাংশ মুসলিম খুবই নাজুক অবস্থায় বসবাস করছে। সেখান থেকে বের হয়ে প্রথম যুগে ফিরে গেলেই প্রকৃত মর্যাদা পাওয়া যাবে। যেমন ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহি বলেছেন, "এই উম্মতের শেষ ব্যক্তিরা উন্নতি সাধন করতে পারবে না যতক্ষণ না পূর্বের যুগে ফিরে যেতে পারবে।" এটা তার যুগের কথা। এই যুগে দুনিয়া রঙিন বেশ ধারণ করেছে তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে!

* *প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সৌদি আরব*
* *উস্তায, আল-মা'হাদ আস-সালাফী, নিজখামার, বটিয়াঘাটা, খুলনা।*

আল্লাহর শপথ! এই জাতি কখনো সফল হবেনা যতদিন না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানা ও সাহাবীদের বুঝের দিকে ফিরে যাবে।

ইমাম, ওয়ায়েজ ও খতীবদের ওপর সবচেয়ে বড় ফরয হল মানুষকে আগেকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাদেরকে বিদ'আত থেকে সতর্ক করা। কেননা বিদ'আত মন্দ, দলাদলি, দুর্বলতা, ভয়, সম্মান ও কল্যাণ বিনষ্টের দিকে আকর্ষণ করে।

তাই আমাদেরকে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে, যত্ন নিতে হবে। তবে এটার মাধ্যমে এ অর্থ নেওয়া যাবে না যে, আমরা দুনিয়াবী বিষয়ে আধুনিক উপকারী জিনিস গ্রহণ করব না। বরং শারঈ নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেটি গ্রহণ করতে শরীয়ত উৎসাহিত করেছে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের মত লোক পেয়ে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, ক্লান্তি বোধ হয় না। যে এই সুন্দর চেহারাগুলো দেখবে সে কল্যাণকর কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে। কিন্তু আমার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ায় এখানেই ইতি টানছি।

পরিশেষে কয়েকটি উপদেশ: আমাকে ও আমার দ্বীনি ভাইদেরকে আল্লাহভীতির ওয়াসিয়ত করছি। আমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহর নিকটে দুনিয়ার মূল্য মাছির ডানার সমপরিমাণও নয়। পুরো দুনিয়া খুবই অল্প। কিয়ামত অতি সন্নিকটে। দুনিয়াতে আমাদের প্রাপ্য খুবই অল্প। আল্লাহই ভালো জানেন আমাদের প্রাপ্য অল্পের মধ্যে কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয়ানক বিষয়। আমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর সাথে দোভাষী ছাড়াই কথা বলবে। বান্দা ডানে তাকিয়ে কৃত আমল ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। বামে তাকিয়ে কৃত আমল ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। সামনে তাকিয়ে শুধু আগুন দেখবে। নবী ﷺ বলেছেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ তোমরা খেজুরের টুকরোর বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।[১৭৫]

আমি নিজেকে ও দ্বীনি ভাইদেরকে আমানত রক্ষা করার উপদেশ দিচ্ছি। আমরা অচিরেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হব। আরো উপদেশ দিচ্ছি সৎ কাজ, আল্লাহভীতিতে সহযোগিতা করতে, কল্যাণ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হতে। জেনে রাখবেন, জ্ঞান থেকে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান যত অর্জন করবেন তত বৃদ্ধি করতে উদ্বুদ্ধ হবেন ও বুঝবেন আপনার অনেক অজানা রয়েছে। সুতরাং 'আমি সবকিছু জেনে ফেলেছি' বলা থেকে বিরত থাকুন। যে বলবে, আমি সবকিছু জানি সে মুর্খামি আচরণ করল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে বলতে আদেশ করেছেন وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا বলুন! হে আমার রব! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন।[১৭৬] তাহলে আমরা কোথায়!?

যখনই ইলমের পথে অগ্রসর হবেন তখনই আপনার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ইলমের জন্য অহঙ্কার করা অনুচিত। বরং সওয়াবের আশায় আরো শিখুন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা অবধি তা খুবই প্রয়োজন।

আল্লাহর অতি সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ সিফাতের মাধ্যমে তার কাছে কামনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন, আমাদের জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দেন, অকল্যাণের দরজা রুদ্ধ করেন, আমাদের ওপর আরোপিত ওয়াজিব কাজগুলো আদায় করতে সহযোগিতা করেন, তার আনুগত্যে আমাদের অন্তরকে কোমল করেন, তাওহীদ ও সুন্নাহর সহযোগী বানান, আমাদের অন্তর এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, আমাদের দেশসহ সকল মুসলিম দেশ ও দেশবাসীকে ফিতনার খারাবি থেকে বাঁচান, সুন্নাহর সহযোগিতা করতে, সুন্নাহকে প্রকাশিত করতে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চক্ষু শীতল করেন, পৃথিবীর সকল মুসলিম থেকে বালা-মুসিবত উঠিয়ে নেন, মুসলিম মজলুমদের সাহায্য করেন ও সকল স্থানে মুসলিমদের শত্রুদের পরাভূত করেন।

আল্লাহর কাছে আরো কামনা করছি, আমরা যেমন এই পবিত্র মসজিদে জমায়েত করছি তেমনি যেন আমরা, আমাদের পিতা-মাতা, পরিবার, ভালোবাসার ব্যক্তিরা জান্নাতে যেতে পারি। তিনি আমাদের কাউকে যেন বঞ্চিত না করেন।

আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত, আর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

---

[১৭৫] *সহীহ বুখারী হা: ৭৫১২*

[১৭৬] *সূরা ত্বহা আয়াত: ১১৪*

ক্বিয়ামুল লাইল; স্রষ্টার সান্নিধ্যে বান্দার প্রাপ্তি

ড. মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম সুলাইমান আর রুমী ❋
ভাবানুবাদ: মাযহারুল ইসলাম ❋

ভূমিকা: নিশ্চয় ক্বিয়ামুল লাইলের মধ্যে রয়েছে অনেক উপকারিতা ও এমন প্রভাব যা মুসলিমকে অভ্যস্থ করে। এবং এটাকে সংরক্ষণ, ধারাবাহিকতা গুরুত্বের দিকে মুসলিমকে অভ্যস্থ করে। তবে হ্যাঁ! ক্বিয়ামুল লাইল বলতে বুঝানো হয়- রাতের সালাত। সেটা হতে পারে তারাবীহ, তাহাজ্জুদ কিংবা নফল সালাত। আমভাবে বলতে গেলে বলা যায়- ক্বিয়ামুল লাইল (তথা রাত্রিকালীন সালাত)। আলোচ্য বিষয়ে আমরা দেখবো ক্বিয়ামুল লাইলের মানবজীবনে প্রভাব ও উপকারিতা। যা একজন মুসলিম মুমিনের জীবনে পরম প্রাপ্তি ও স্রষ্টার সান্নিধ্যে বান্দার জীবন সফলমণ্ডিত হওয়ার এক ও অনন্য চক্ষুশীতলকারী ইবাদত। সত্যিকারার্থে ক্বিয়ামুল লাইল হল স্রষ্টার পক্ষ হতে বান্দার গোপন ঢাল। যা দিয়ে বান্দা বিপদে আত্মরক্ষা করতে পারে। রাত্রির অন্ধকারে স্রষ্টার সান্নিধ্যে একাকিত্বে দু'নয়নে অশ্রুসিক্ত করে পাপের ক্ষমা চাওয়ার এক শ্রেষ্ঠ সময় ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। (অনুবাদক)

১. ক্বিয়ামুল লাইল আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়কে বাস্তবায়ন করে- নিশ্চয় ক্বিয়ামুল লাইল বান্দার উপর আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের একটি অন্যতম পন্থা। শুকরিয়া আদায়কারীর জন্য নেয়ামতকে বৃদ্ধি করার কথা আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

যদি তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো তাহলে আমি আমার নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দিব আর যদি তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় না করে অস্বীকার কর তাহলে জেনে রাখো! আমার আযাব খুবই মারাত্মক।[১৭৭] এ ব্যাপারে মা আয়েশা ﵂ বলেন, নবী ﷺ রাত্রিতে ক্বিয়াম করতেন এমনকি তাঁর দু'পা ফুলে যেত। মা আয়েশা ﵂ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বলেন- হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! কেন আপনি রাত্রিতে ক্বিয়াম করেন অথচ আল্লাহ আপনার আগের পরের সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেন: আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দার অন্তর্ভুক্ত হবো না?।[১৭৮]

২. ক্বিয়ামুল লাইল আদায়কারীকে যাবতীয় পাপ অবাধ্যতা ও অনিষ্ট কাজ থেকে নিষেধ করে- এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾

নিশ্চয় সালাত যাবতীয় অশ্লীল-মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। আর আল্লাহর জিকির হল বড়। আর আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।[১৭৯]

সাহাবী আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, এক ব্যক্তি নবীর কাছে এসে বলেন- অমুক ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে আর দিনের বেলায় চুরি করে। রাসূল ﷺ বলেন: সে যা বলছে অচিরেই তা তাকে বাধা দিবে।[১৮০] সালাত আমভাবে যাবতীয় অশ্লীল-মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। কিন্তু ক্বিয়ামুল লাইলের মধ্যে রয়েছে এমন বৈশিষ্ট্য যা তা আদায়কারীকে নিষেধ করে। নিশ্চয় সে যখন দাঁড়ায় তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বলে। তার প্রতিপালক তার সব আমল পেশ করে। সে কারণে সে আশংঙ্কা করে যে, তার কারণে তার আমল কবুল হওয়া না হওয়ার এজন্য সে যাবতীয় অবাধ্যতামূলক কাজ পরিহার করে।

৩. ক্বিয়ামুল লাইল শরীরের যাবতীয় রোগকে বিতাড়িত করে- ক্বিয়ামুল লাইল শরীরের যাবতীয় রোগকে বিতাড়িত করে। সর্বপ্রথম অপারগতা ও অলসতার রোগকে বিতাড়িত করে। তাবেঈ আবী ঈদ্রীস

❋ শিক্ষক কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
❋ মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর, ঢাকা।

[১৭৭] সূরা ইবরাহীম আয়াত: ৭
[১৭৮] সহীহ বুখারী হা: ১০৭৮ ও সহীহ মুসলিম হা: ২৮২০
[১৭৯] সূরা আনকাবুত আয়াত: ৪৫
[১৮০] মুসনাদে আহমাদ ২/৪৪৭

আল খাওলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, সাহাবী বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা অবশ্যই তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবে। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের অভ্যাস। তোমাদের জন্যে তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য, পাপের ক্ষমা, পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ এবং দেহ থেকে রোগ ব্যাধির বিতাড়ন।[১৮১]

৪. ক্বিয়ামুল লাইল আদায়কারীকে আত্মিক প্রশান্তির উত্তারাধিকারী বানায়- এ ব্যাপারে সালাফগণের অনেক বর্ণনা রয়েছে।

১. ইবনে মুনকাদির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: তিনটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার কোনো স্থায়ী স্বাদ নেই- ১. ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহ/তাহাজ্জুদ) ২. মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ ৩. জামাআতের সাথে সালাত আদায়।

২. আবু সুলাইমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: খেল-তামাশায় মত্ত প্রেমিকদের চেয়ে ইবাদতগুজার ব্যক্তির রাতে জেগে ইবাদতে মশগুল থাকাতে রয়েছে অনেক স্বাদ, মিষ্টতা। যদি রাত না থাকত তাহলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছাই থাকতো না।

৩. অন্য কেউ বলেন: যদি রাজা-বাদশারা জানতো আমরা রাতে কী নেয়ামত পাই তাহলে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করত।

৪. আলী বিন বাকার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: চল্লিশ বছর সূর্য উদিত ছাড়া আমাকে অন্য কিছু চিন্তাগ্রস্থ করেনি।

৫. ফুজাইল বিন ইয়াজ বলেন- যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমি আনন্দিত হই রাত্রির অন্ধকারে আমার রবের সান্নিধ্যে একাকিত্বের জন্য। আর যখন সূর্য উদিত হয় মানুষের সামনে তখন আমি চিন্তগ্রস্থ হই।

৫. ক্বিয়ামুল লাইল সৎ সন্তান পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম- ক্বিয়ামুল লাইলে শীতের রাতে জাগরণকারী পিতার দুআর ফলাফল হল সৎ সন্তান। যখন বান্দা সালাতে দাঁড়ায় আল্লাহর কাছে তার বংশের সৎ সন্তান ও মৃত্যুর পর তাদের হেফাজতের দোআ করে।

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾

আর ঐ প্রাচীরটি - ওটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং তোমার রব্ব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তোমার রব্বের দেয়া তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজ হতে কিছু করিনি; তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে এটাই তার ব্যাখ্যা।[১৮২]

৬. ক্বিয়ামুল লাইল আদায়কারী তাদের চেহারায় নূর অর্জন করে- নিশ্চয় রাত্রিতে ইবাদতগুজার আগ্রহী ব্যক্তি রাতে খুব কম অংশই ঘুমায়। তবে তারা তাদের চেহারায় নুর অর্জন করে সারা দিনে ও রাতে। এমনকি মৃত্যুর সময়ও। এ ব্যাপারে অনেক সালাফগণের বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -কে বলা হয়- তাহাজ্জুদ গুজার ব্যক্তিরা মানুষের মধ্যে তাদের চেহারায় সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে কিছুই পরোয়া করে না। তিনি বলেন, কারণ তারা তাদের রহমানের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করে। অতঃপর সেই কারণে তাদের রব্ব তাদের চেহারায় নুরসমূহের মধ্যে থেকে নুর পরিয়ে দেন।

৭. ক্বিয়ামুল লাইল রিজিকের প্রশস্ততার অন্যতম গুণ- আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন যে, সে চিন্তাও করতে পারবে না। এ কারণে তারা তাহাজ্জুদে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা পোষণ করে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর প্রতিদানের আশা পোষণ করো যিনি এমনভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন যে চিন্তাও করতে পারবে না এমনকি টেরও পাবে না। এবং তিনি জীবন চলার সংকীর্ণতাকে বিতাড়িত করে মুক্তি দিবেন।

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ

[১৮১] *তিরমিযি হা: ৩৫৪৯*

[১৮২] *সূরা কাহফ আয়াত: ৮২*

مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿

তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ওটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন।

আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিযক্; যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।[১৮৩]

৮. ক্বিয়ামুল লাইল, দু'আ কবুলের অন্যতম মাধ্যম- রাসূল ﷺ ক্বিয়ামুল লাইলের মধ্যে যে মহাকল্যাণ, অফুরন্ত দয়া রয়েছে সে ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। সাহাবী জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- নিশ্চয় রাতে এমন একটি সময় আছে যে সময়ে বান্দা আমার কাছে যা চাইবে কোন কল্যাণকর বিষয়ে আমি তাকে তা দান করবো।[১৮৪]

অন্য হাদিসে এসেছে- আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলেন- আছে কি কেউ আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দান করবো? আছে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো? এভাবে সূর্য উদিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ঘোষণা দেন।[১৮৫]

অতএব যে এই সময়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্যার সমাধান করবেন। তার বিপদ দূর করবেন। তার বক্ষকে প্রশস্ত করবেন। এবং তাঁর জীবন চলার পথে সংকীর্ণতাকে বিতাড়িত করে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করবেন।

৯. ক্বিয়ামুল লাইল আল্লাহর ভালোবাসা ও তাকে সন্তুষ্ট করার অন্যতম কারণ- এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে আমার অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি স্বয়ং তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করলাম। আমি যা তার ওপর ফরজ করেছি তার দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জনকে আমি বেশি ভালোবাসি। বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করে নফল ইবাদতের দ্বারা। এমনকি আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যে কান দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যে চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাঁটে। আর সে যা চায় আমি তাকে অবশ্যই তা দান করবো। যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় দান করবো।[১৮৬]

সাহাবী আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন- আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর মানুষকে ভালোবাসেন। তাদের ব্যাপারে হাসেন এবং তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো- ঐ ব্যক্তি যার সুন্দরী স্ত্রী ও পরিপাটি বিছানা থাকা সত্ত্বেও রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ এই লোককে দেখে বলেন- হে ফেরেশতাগণ! সে আমার জন্য তার প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করেছে। ঘুমানোর সুযোগ থাকার পরেও সে না ঘুমিয়ে আমার জিকির করে।[১৮৭]

১০. যাবতীয় ফেতনা থেকে মুক্তির অন্যতম পন্থা ক্বিয়ামুল লাইল- আমভাবে সালাত যাবতীয় ফেতনা থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু ক্বিয়ামুল লাইল খাছ। যাবতীয় ফেতনা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য। সহীহ বুখারীতে এসেছে, উম্মে সালমা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন: একদিন রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন- সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা রাত্রিতে ফেতনা অবতীর্ণ করেছেন।[১৮৮]

অন্য হাদিসে এসেছে- তোমরা তাড়াতাড়ি আমল কর। কেননা ফেতনা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের টুকরোর মতো অবতীর্ণ হয়েছে। একজন লোক সকাল করবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা করবে কাফের অবস্থায়। আর একজন লোক সকাল করবে কাফের অবস্থায় আর সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায়। সে তার দ্বীনকে বিক্রি করবে দুনিয়ার সামান্য বিনিময়ে।[১৮৯] ▣▣

[১৮৩] *সূরা আত-তালাক আয়াত: ২,৩*
[১৮৪] *সহীহ মুসলিম হা: ৭৫৭*
[১৮৫] *মুসনাদে আহমাদ-৪/৮১*
[১৮৬] *সহীহ বুখারী হা: ৬১৩৭*
[১৮৭] *হাকেম- ১/২৫*
[১৮৮] *সহীহ বুখারী হা: ১১৫*
[১৮৯] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৮*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) ঃ *আশুরা মুহাররম কি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা কাণ্ড হতে শুরু, না তাঁর পূর্বেও ছিল? দলীলসহ জানাবেন।*

আবুল বাশার, ভালুকা, ময়মনসিংহ

উত্তর ঃ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন দেখেন ইয়াহুদীরা আশুরার সিয়াম পালন করছে। তিনি প্রশ্ন করলেন এ দিনের রহস্য কী? তারা বলল, এটা খুব ভালো দিন, যে দিনে আল্লাহ বাণী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু হতে মুক্ত করেছেন। ফলে মুসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সিয়াম পালন করেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমিই তো মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসরণের বেশি হকদার, ফলে তিনি সিয়াম রাখেন এবং তার অনুসারীদের সিয়াম রাখার নির্দেশ দেন।[১]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সিয়াম পালন করত। আর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমনের পর সিয়াম পালন করেন ও নির্দেশ প্রদান করেন।[২]

উক্ত হাদীসদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম হিজরী হতে ইসলামে আশুরার সিয়াম চালু হয়। এর পূর্বে জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সিয়াম পালন করত। আরো পূর্বে মুসা (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম আশুরার সিয়াম পালন করেন। আর হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৬১ হিজরীতে মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ করেন। যার ৬১ বছর পূর্বে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামে আশুরার সিয়ামের বিধান চালু করেন। সুতরাং হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে আশুরার সিয়াম নয়; বরং এর বহু পূর্বে আশুরার সিয়াম চালু হয়। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত ঐতিহাসিকভাবে আশুরা মুহাররমে ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে আশুরার ইবাদতের সাথে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

প্রশ্ন (২) ঃ *আশুরা মুহাররম কি শোক পালনের দিন না আনন্দের দিন-দয়া করে জানাবেন।*

আজহারুল ইসলাম, জয়দেবপুর, গাজীপুর

উত্তর ঃ আশুরা মুহাররম মূলত মুসা (আলাইহিস সালাম) মুক্তি লাভের পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিয়াম পালন করেন। সেই সূত্রে আমাদের নবী সিয়াম পালন করেন ও সিয়াম পালনের বিধান জারি করেন। এটি একটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ইবাদত। আনন্দ বা শোক কোনোটাই নয়। কিন্তু পরবর্তীতে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে শিয়াপন্থীরা শোক পালনের দিন বানিয়ে নেয়। আর শিয়া বিরোধীরা আনন্দের দিন বানায় নেয়। অনুরূপ ইয়াহুদীরাও বিজয় ও আনন্দের দিন হিসেবে পালন করে। তবে তাদের আনন্দ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিষয়কে কেন্দ্র করে নয় বরং তাদের বিজয়কে কেন্দ্র করে। অপরপক্ষে ইসলামে তিন দিনের বেশি শোক পালনের সুযোগ নেই। বরং অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে। অতএব আমাদের শোক পালন ও আনন্দ কোনটাই নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ইবাদত করব। ওয়াল্লাহু আলাম

প্রশ্ন (৩) ঃ *আশুরার সিয়ামের ফযীলত কী? এবং কয়টি সিয়াম রাখতে হয় দলীলসহ জানতে চাই।*

জাহাঙ্গির আলম, কাউখালী, রাঙ্গামাটি

উত্তর ঃ সাহাবী আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন .....আশুরা মুহাররমের সিয়াম, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশাবাদী যে, তিনি এর বিনিময়ে পূর্বের এক বছরের গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে আশুরার দিরসের সিয়ামের চেয়ে অন্য কোনো দিনের সিয়ামকে বেশি গুরুত্ব দিতে দেখিনি এবং রামাযান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসকে বেশি গুরুত্ব দিতে দেখিনি।[৪]

আশুরা মুহাররমের সিয়াম দশম দিনে এবং উত্তম হলো পূর্বের দিন নবমসহ দুই দিন সিয়াম রাখা।

---

[১] *সহীহ বুখারী হা: ২০০৪, সহীহ মুসলিম হা: ১১৩০*
[২] *সহীহ বুখারী হা: ২০০২, সহীহ মুসলিম হা: ১১২৫*
[৩] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৬৩, আবূ দাউদ হা: ৩৪৩৫*
[৪] *সহীহ বুখারী হা: ২০০৬, সহীহ মুসলিম হা: ১১৩২*

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আশুরার সিয়াম রাখলেন এবং রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন প্রশ্ন আসল যে, এ দিনটিকে ইয়াহুদী ও নাসারারা অনেক গুরুত্ব দেয় (অতএব তাদের সাথে আমাদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: ইনশা আল্লাহ আগামী বছর বেঁচে থাকলে নবম তারিখেও সিয়াম রাখব। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি।[৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: ..... এ মর্মে হাদীসগুলো একটা অপরটার সমর্থক, অতএব আশুরার সিয়ামের তিনটি স্তর। সবচেয়ে পরিপূর্ণ হলো আগে-পিছেসহ মোট তিন দিন সিয়াম রাখা। দ্বিতীয় স্তর হলো নবম ও দশম দুদিন সিয়াম রাখা, মূলত: এ বিষয়েই বেশি হাদীস রয়েছে। তৃতীয় হলো শুধু দশম তারিখে রাখা।[৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইময়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: আশুরার সিয়াম শুধু দশম দিনে রাখা মাকরুহ নয়।[৭]

☞ প্রশ্ন (৪) ঃ ***আশুরা মুহাররমে রাজপথে মিছিল এবং মিষ্টি বিতরণ এর রহস্য কী এবং এতে অংশগ্রহণের বিধান কী?***

ইয়াসীন শেখ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

উত্তর ঃ আশুরা মুহাররমে রাজপথে মিছিল করে থাকে শীআ সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা এর মাধ্যমে হুসাইন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর প্রতি ভালোবাসা ও শোক প্রদর্শন করে থাকে। আর এ উপলক্ষে বিভিন্ন জন মিষ্টি মান্নত ও বিতরণ করে।

প্রথমত ইসলামে এ ধরনের শোক পালনের বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

«ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»

শোক পালনে যে গাল চাপড়াবে, কাপর ছিঁড়বে এবং জাহেলী প্রথা অবলম্বন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮] অতএব কোনো মুসলিম এ ধরনের গর্হিত নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতে পারে না এবং যে কোনো ভাবে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

তোমরা পরস্পরে কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা কর না।[৯] অনুরূপ সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা যাবে না এবং খাওয়া ও যাবে না। সবই হারাম, ওয়াল্লাহু আলাম।

☞ প্রশ্ন (৫) ঃ ***আশুরা মুহাররমে সিয়াম ছাড়াও অন্যান্য ইবাদত যেমন কুরআন খতম, দান, সদকা ইত্যাদি করার বিধান জানতে চাই।***

আলীম শেখ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

উত্তর ঃ আশুরা মুহাররমের সিয়াম পালন ছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম হতে ভিন্ন কোনো বিশেষ ইবাদত প্রমাণিত হয়নি। বিশেষভাবে কুরআন খতম ও দান সদকা সবই শি'আপন্থীদের কালচার। অতএব এসবই বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা সম্পর্কে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই তা প্রতাখ্যাত।[১০]

☞ প্রশ্ন (৬) ঃ ***ইয়াযিদ এর বিষয়ে আমাদের ভূমিকা কী হবে? অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলবেন।***

ফুরকান মিয়া, মতলব, চাঁদপুর

উত্তর ঃ ইয়াযীদ এর বিষয়ে আবেগবশত অনেকেই অনেক কিছু বলে থাকে। বিশেষ করে শি'আদের স্বভাবই হলো ইয়াযীদ এর কুৎসা রটনা করা, তাকে লানত বর্ষণ করা ইত্যাদি। এতে প্রভাবিত হয়ে অনেকেই একই সুরে কথা বলে, কোনো বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করে না। এমনটি কখনই উচিত নয়। ইয়াযীদ এর বাবা মু'আবিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। সাহাবীকে ঈমান অবস্থায় দেখলে তাকে তাবেঈ বলা হয়। সুতরাং তিনি তাবেঈ, আবার

---

[৫] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৩৪, আবূ দাউদ হা: ২৪৪৫*
[৬] *যাদুল মাআদ, ২/৭৫,৭৬ পৃ:*
[৭] *আল ফাতাওয়া আল কুবরা পৃ: ৫*
[৮] *সহীহ বুখারী হা: ১২৯৪*
[৯] *সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত: ২*
[১০] *সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৮*

তার চরিত্রিক বহু দোষ-ত্রুটি পাওয়া যায়। সেজন্য মর্যাদাশীল তাবেঈ বলার সুযোগ নেই। ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

أول جيشي يَغْزُو مَدِينَةَ قَيْصَرَ যে সামরিকবাহিনী প্রথম কায়সার (কনস্টান্টিনোপল) জয় করবে তারা ক্ষমা লাভ করবে।

আর ইয়াযীদ এর নেতৃত্বে সর্ব প্রথম কনস্টান্টিনোপল অভিযান হয়। এতে তিনি অপরাধী হলেও তাঁর ক্ষমা লাভের সুযোগ রয়েছে।[১১]

এছাড়াও ইয়াযীদ এর প্রত্যক্ষ নির্দেশে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হয়েছেন এমনটাও প্রমাণিত হয় না। তবে হ্যাঁ ইয়াযীদের বহু ত্রুটি রয়েছে। এ জন্য কি তাকে অশালীন ভাষায় গাল মন্দ করা যাবে? ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর একটি বর্ণনা হতে তার উত্তর আমরা পেয়ে যাই। ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ছেলে সালিহ জিজ্ঞাসা করলেন: হে বাবা কিছু মানুষ ইয়াযীদকে ভালোবাসে। আপনি কী মনে করেন? তিনি বললেন না কোনো ঈমানদার ইয়াযীদকে ভালোবাসতে পারে না। প্রশ্ন: তাহলে বাবা আপনি কেন ইয়াযীদকে লানত বর্ষণ করেন না? উত্তর: হে বৎস! তুমি কখনো তোমার বাবাকে কাউকে লানত বর্ষণ করতে দেখেছ!...

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: প্রসিদ্ধ ইমামগণ যা সঠিক মনে করেন তা হলো:

أَنَّهُ لَا يُخَصُّ بِمَحَبَّةٍ وَلَا يُلْعَنُ.

তার প্রতি বিশেষ কোনো ভালোবাসা থাকবে না আবার তাকে অভিশাপ ও গালি দেওয়াও হবে না।[১২]

বিশেষভাবে ইয়াযীদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কেউ কেউ মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কেও কেউ খারাপ মন্তব্য করে থাকে। যা চরম অন্যায় ও মুনাফিকী কাজ। অতএব আমাদের সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। আল্লাহু আলাম।

☞ প্রশ্ন (৭) ঃ *জান্নাতুল ফিরদাউস এর বাসিন্দাদের গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্য / জান্নাতুল ফিরদাউস এ যাওয়ার জন্য কী কাজ বা আমল করতে হবে?*

বড় মির্জাপুর, খুলনা।

[১১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/৬২৭ পৃ:*

[১২] *মাজমু ফাতাওয়া- ১/২৯২ পৃ:, সাউদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড-ফাতাওয়া নং ১৪৬৬, ৫/১৮০ পৃ:*

উত্তর ঃ জান্নাতুল ফিরদাউস এর বাসিন্দাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বা জান্নাতুল ফিরদাউসে যাওয়ার জন্য যে আমল করতে হয় এ মর্মে কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্নভাবে অনেক বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে প্রথম গুণ বা আমল হলো প্রকৃত ঈমানদার হওয়া। অতঃপর আরো বেশ কিছু গুণাবলী রয়েছে। যেমন ছয়টি গুণ আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনুন এ বর্ণনা করেছেন, এরপর বলেন, তারাই হলো জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী। উক্ত ছয়টি গুণ নিম্নরূপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ○ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ () فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ-যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র। যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান, তারাই হবে উত্তরাধিকারী।[১৩]

☞ প্রশ্ন (৮) ঃ *আমার দু'জন, ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে মেয়ে (সালমা), আর ছোট হচ্ছে ছেলে (আব্দুল্লাহ)। আমার স্ত্রী আমাকে সালমার আব্বু বলে ডাকে। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সালমার আব্বু বলে ডাকলে কোনো গোনাহ হবে কী? অথবা কি বলে ডাকলে উত্তম হবে?*

নামঃ মো আমজাদ খাঁন , মেহেরপুর, হালদার পাড়া

[১৩] *সূরা আল মু'মিনুন আয়াত: ১-১০*

উত্তর ঃ সালমার আব্বু, আরবী ভাষায় বলা হয় আবূ সালামা। এটি কুনিয়াত বা উপনাম। এ ধরনের উপনামে সম্বোধন করে ডাকা ভালো, কোনো আপত্তি নেই। ওয়াল্লাহু আলাম।

☞ **প্রশ্ন (৯) ঃ** ***বর্তমানে আমাদের সমাজের মধ্যে যে সকল মসজিদ রয়েছে প্রায় সকল মসজিদে দেখা যায়, মসজিদের ভিতর থেকে মাইক এর মাধ্যমে আযান দেওয়া হয়। এটা কুরআন এবং সহীহ হাদীসসম্মত হচ্ছে?***

খাইরুল ইসলাম, ফুলবাড়ীয়া ময়মনসিংহ

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়তে আযান-এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সালাতের সময় অবগত করানো। মানুষ যাতে আওয়ায শুনতে পায় এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদের ছাদে বা মিনারায় আযান দেয়া হতো। এটাই প্রকৃত সুন্নাহ। তবে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে মাইক্রোফোন ব্যবহারের মাধ্যমে আযানের আওয়ায আরো দূরে পৌঁছানো সম্ভব হয়। তাই মসজিদের ছাদে বা মিনারায় আযান দেয়া হয় না। কিন্তু মসজিদের ছাদে বা মিনারায় মাইকের হর্ণ স্থাপন করা হয়। এমতাবস্থায় যদি মসজিদের বাইরে ওপরে গিয়ে আযান দেয়া যায় তাহলে সেটা অবশ্যই উত্তম। আর সম্ভব না হলে তা বিদ'আত হবে না। সাউদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড এমনি ফাতাওয়া প্রদান করেছে। *(ফাতাওয়া না. ৫০৬৯)* ওয়াল্লাহু আলাম

☞ **প্রশ্ন (১০) ঃ** ***আমি একজন পলিটেকনিক্যালে স্টুডেন্ট। আমরা যে সমস্ত রোবট তৈরি করে থাকি তা অনেকগুলোই মূর্তির সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। অনেকগুলো আবার মানব আকৃতির হয়ে থাকে। তো এসব রোবট বাসা-বাড়িতে রেখে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?***

মোঃ আরিফ ইসলাম, ইসলামপুর, জামালপুর,

উত্তর ঃ ইসলামে প্রাণী জগতের মূর্তি তৈরি করা নিষিদ্ধ এবং পরকালে তার শাস্তি ভয়াবহ। অতএব রোবটসমূহ যদি প্রাণী জগতের ন্যায় হুবহু না হয় তাহলে বানানো এবং ব্যবহার করা বৈধ হবে। নচেৎ নিষিদ্ধ। ওয়াল্লাহ

কবিতা

প্রার্থনা

ডা: শামছুল আলম*

হে অসিম ক্ষমতাধর প্রভু রক্ষা কর আমায় সকল বিপদ হতে,
তুমি ছাড়া নাইকো কেহ সাহায্যকারী ইহ জগতে।
পরকালেও সর্বেসর্বা তুমি হে প্রভু অসীম ক্ষমতাময়,
রক্ষা কর প্রভু আমায় দু-জাহানের সকল সমস্যাদ্বয়।
যিকির আযকার আর আমার ইবাদত যত,
যাহা করি বন্দিগী তোমার কাছে অবিরত।
কোন মাধ্যম আমি কখন বিশ্বাস করি না,
তুমি শ্রষ্টা আমি সৃষ্টি রাসূল ছাড়া কাওকে মানি না।
বলেছো কুরআনে তুমি যাহা চাও তাহা শুধু তোমার নিকটে,
নিশ্চয় দিবে তুমি তাহা তোমারও রহমতে।
ফকিরকে বাদশা বাদশাকে করেছ ফকির তোমার ক্ষমতাতে,
অসংখ্য প্রমাণ আছে তাহা তোমার কুরআনেতে।
ঋণগ্রস্থ বিপগ্রস্থ আমি সাহায্য চাই প্রভু তোমার নিকটে,
রক্ষা কর প্রভু তুমি আমায় সকল বিপদে আপদে।
পিতা মাতাকে তুমি ক্ষমা করে দিও হাশরের ময়দানে,
তুমি তো আমায় দিয়েছ শিক্ষা তোমার পবিত্র কালামে।
আমার সালাম ও দুরুদ পৌঁছে দিও প্রভু রাসূলের শানে,
আমাকে দিও মর্যাদা প্রভু তার সাহাবাদের মানে।
আমার দুআ ও দরুদ পৌঁছে দিও প্রভু নিকটে সাহাবায়ে আজমাইন,
ক্ষমা কর প্রভু হে রাহমাতেকা ইয়া রাহমানের রাহিম।

* সেক্রেটারী, গুঠাইল এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস